ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES
Cotton Printed Sarees
Contact - 22188744/1386

স্বস্তিকা

দাম ঃ ৪.০০ টাকা

আসবাব
বর্ধমান
(০৩৪২) ২৫৬৫৯৩১

৬২ বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ।। ১৩ আষাঢ় ১৪১৭ সোমবার (যুগাব্দ - ৫১১২) ২৮ জুন, ২০১০ ।। Website : www.eswastika.com

এক দশক পর কাজ শুরু হচ্ছে রোটাং সুড়ঙ্গের

নিজস্ব প্রতিনিধি।। কার্গিল যুদ্ধের সময়েই টের পাওয়া গিয়েছিল অভাবটা। পাকিস্তান আচমকাই শ্রীনগর-লে রোড বন্ধ করে দেবার চেষ্টা করেছিল। বিকল্প পথের ব্যবস্থা না থাকায় কূটনৈতিক লড়াই-এ বেশ বেকায়দায় পড়ে গিয়েছিল ভারত। তৎকালীন এন ডি এ সরকার বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে রোটাং সুড়ঙ্গ নির্মাণের প্রকল্প নিয়েছিলেন। বিজেপি পরিচালিত সরকারের সেই প্রকল্প রূপায়ণের কাজ শুরু হতে চলেছে এতদিনে, আগামী ২৮ জুন ইউ পি এ চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর প্রস্তর ফলক

বরফাবৃত রোটাং পাস

পোঁতার মাধ্যমে।

দীর্ঘ ৮.৮ কিমি দীর্ঘ সুড়ঙ্গটির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল আজ থেকে সাতাশ বছর আগেই। সেই মতো একটা পরিকল্পনাও হয়েছিল তখন। সবরকম আবহাওয়ার সঙ্গে মানানসই লাদাখ এবং সিয়াচেনের দিকে যাবার একটি রাস্তা তৈরি করার কথা হয়েছিল। সেই কারণেই সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণের উদ্যোগ। এরপর কার্গিল যুদ্ধের সময়েই এই রাস্তার অভাব টের পাওয়া যায়। নিরাপত্তার দিক দিয়েও রাস্তাটা খুবই জরুরি। গত বছর ক্যাবিনেটের নিরাপত্তা পরিষদ বিজেপি আমলের প্রকল্প সুড়ঙ্গের মাধ্যমে রাস্তা তৈরিতে অনুমোদন দেয়। সুড়ঙ্গটি গড়তে খরচ পড়বে প্রায় ১,৪৯৫ কোটি টাকা। অস্ট্রেলিয়ার স্টারবাগ কোম্পানীর সহায়তায় আশা করা যাচ্ছে আগামী ২০১৫-এর মধ্যে সুড়ঙ্গ পথটি তৈরি হয়ে যাবে।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৩,০০০ ফুট উচ্চতায় এবং মানালি থেকে ৫১ কিমি দূরে সুড়ঙ্গটি গড়ে উঠবে। বছরের যে কোনও সময় লাদাখ কিংবা হিমাচলের লাহুল-স্পিতি উপত্যকায় যাতায়াত করা যাবে সুড়ঙ্গটি দিয়ে। বিষয়টা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ বছরের ছ'মাসই রোটাংপাস আবৃত থাকে বরফে। এই সুড়ঙ্গটি আরও একটা উপকার করবে। যাত্রাপথ যেমন কমবে ৪৮ কিলোমিটার তেমনি সময়ও বাঁচবে চার ঘণ্টা। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এত বেশি উচ্চতায় এটিই হবে পৃথিবীর বৃহত্তম সুড়ঙ্গপথ। এর কাছাকাছি একমাত্র তাজাকিস্তানের আনজব সুড়ঙ্গটিকেই রাখা যেতে পারে। সেটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১১ হাজার কিলোমিটার

(এরপর ৪ পাতায়)

কাশ্মীর সরকারের দু'মুখো নীতি

অমরনাথে প্রবেশ করের নামে জিজিয়া কর আদায়

নিজস্ব প্রতিনিধি।। জম্মু-কাশ্মীর সরকার বৈষ্ণোদেবী ও অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের গাড়ীর উপর প্রবেশ কর ধার্য করায় তার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে দেশের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি।

গত ১৮ জুন জম্মু ও কাশ্মীর সরকারের কাছে বিজেপি নেতৃত্ব দাবী করে, অবিলম্বে অমরনাথ যাত্রায় ও বৈষ্ণোদেবী দর্শনের জন্য যে সমস্ত গাড়ি-ঘোড়া ঢুকবে তাদের কাছে কোনও প্রবেশ কর (এন্ট্রি ট্যাক্স) নেওয়া চলবে না। উল্লেখ্য, গড়পড়তা প্রত্যেক গাড়িকেই হাজার দু'য়েক টাকা প্রবেশ-কর দিতে হবে। বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক বিজয় গোয়েল সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, মোগল আমলে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের আর্থিক নির্যাতন করার জন্য তৎকালীন বাদশারা জিজিয়া করের প্রচলন করেছিলেন। আজকের দিনে জম্মু-কাশ্মীর সরকার ঠিক একই ঢঙে অমরনাথ এবং মাতা বৈষ্ণোদেবী তীর্থযাত্রীদের ওপর প্রবেশ কর বসাচ্ছেন। হজ যাত্রীদের জন্য যেখানে প্লেনের ভাড়া সহ কোটি কোটি টাকার ভতুর্কি দেওয়া হচ্ছে সেখানে এই প্রবেশ কর জিজিয়া করের সামিল। গোয়েলের বক্তব্য অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীর সরকার ১৯৫৭ সালের জম্মু-কাশ্মীর মোটর ভেহিকলস ট্যাক্সেশন আইনে 'নোটিফিকেশন' জারি করে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। তাতে বলা হয়েছে বৈষ্ণোদেবী মন্দির চত্বরে কোনও মোটর গাড়ি প্রবেশ করলে তিনদিন থাকার জন্য ২০০০ টাকা দিতে হবে। সেখানে সাতদিনের বেশি সময় ধরে কোনও গাড়ি থাকলে প্রতি দিনের জন্য অতিরিক্ত ২০০০ টাকা দিতে হবে। একইভাবে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ক্ষেত্রে সাতদিন বা তার কম সময়ে ওই চত্বরে ভ্রমণের জন্য যান-বাহনের ক্ষেত্রে কর ধার্য করা হয়েছে ২০০০ টাকা। তার বেশি সময় থাকলে প্রতিদিন অতিরিক্ত ২০০০ টাকা পড়বে। অমরনাথ যাত্রাপথে যারা 'লঙ্গরখানা'র আয়োজন করবেন, তাদের ২৫০০০ টাকা দিতে হবে সরকারকে। যদিও তীর্থযাত্রীদের সুখ-সুবিধের দিকে লক্ষ্য রেখেই নাকি এটা করা হচ্ছে বলে সরকারি তরফে জানানো হয়েছে। বিজেপি-র অভিযোগ, জম্মু-কাশ্মীর সরকার আসলে হিন্দু তীর্থযাত্রীদের সেন্টিমেন্ট নিয়ে ছেলেখেলা করছে। গোয়েলের দাবী, ''তীর্থযাত্রীদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি নজর দেবার পরিবর্তে তীর্থ যাত্রাকে বিঘ্নিত করবার সবরকম চেষ্টা করে চলেছে সরকার।'' এ-প্রসঙ্গে কেন্দ্রের কাছে বিজেপি-র দাবী, লজ্জাজনক রাজনীতির বৃত্তের বাইরে রেখে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে তাদের ধর্মাচরণের সুবন্দোবস্ত করুক সরকার।

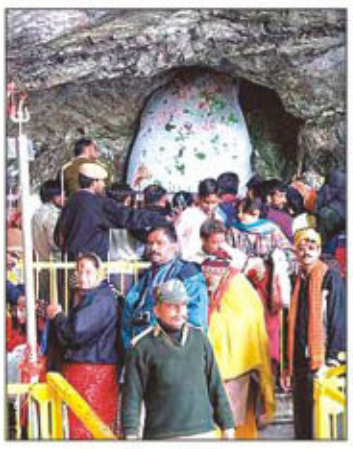
অমরনাথ

পণ্ডিতদের 'নতুন কাশ্মীর' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখালেন ওমর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। অমানিশার মধ্যে আলোর ঝিলিক। কিন্তু সেটা বিদ্যুৎ চমকের না সূর্যালোকের তা বুঝে উঠতে পারছেন না কাশ্মীরী পণ্ডিতরা। তারা ঘরপোড়া গরু, তাই সামান্যতম সিদুঁরে মেঘের আভাস পেলে তাঁরা তো ডরাবেনই। জম্মু-কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর থেকে মাত্র ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত গান্দেরবাল জেলার তুলমুল্লায় অবস্থিত ক্ষীরভবানী মন্দিরে প্রায় হাজার পঞ্চাশেক কাশ্মীরি পণ্ডিত জড়ো হয়েছিলেন সম্প্রতি। স্বভূমি থেকে পণ্ডিতদের উৎখাতের পর প্রায় একুশ বছর আগে সংঘটিত মাতা রাঘেন্য মন্দিরে পণ্ডিত সমাবেশের পর এটাই বৃহত্তম পণ্ডিত সমাবেশ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, 'জ্যৈষ্ঠ অষ্টমী'-র জন্য আয়োজিত বিশেষ পূজায় উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা। আপাতত তিনি কাশ্মীরে পণ্ডিতদের প্রত্যাবর্তনের এবং 'নতুন কাশ্মীর' গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়ে গেলেন। বললেন, ''কাশ্মীরি পণ্ডিতরা কাশ্মীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কাশ্মীরিয়ানার ঐতিহ্যে যেটুকু আঘাত লেগেছে, আমরা তা ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করব। তবে কাশ্মীরিয়ানার ভুল ব্যাখ্যা থেকে কিছু মানুষজনের বিরত থাকা উচিত। এটা এখন স্পষ্ট যে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ছাড়া কাশ্মীরিয়ানার সংস্কৃতি পূর্ণতা পেতে পারে না।''

ক্ষীরভবানী

তবে এটাও ঠিক, আবদুল্লা এত বড় বড় কথা বললেও কাশ্মীরি পণ্ডিতরা নিরাপত্তাহীনতার কারণেই ঘর ছেড়েছিলেন। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হলে আবদুল্লা মন্তব্য করেন, ''আমরা দু'পক্ষের সম্পর্কের উন্নতি করার চেষ্টা করছি; বিশেষত দু'পক্ষের যুবকদের মধ্যে। কারণ নবীন প্রজন্মের জানা উচিত, তাদের পূর্বপুরুষরা তাদেরকে একটি ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি যার মূলমন্ত্র 'একতা' তার উত্তরসূরী করে গিয়েছেন। ক্ষীরভবানী মন্দিরের ধর্মার্থ ট্রাস্টির সদস্য আর এল ভান জানিয়েছেন, স্থানীয় মুসলিমরা তীর্থক্ষেত্রে আসার জন্য হিন্দুদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন, ''মুসলিমরা এখন হিন্দুদের পুজোয় সাহায্য করছে। এই চত্বরে মুসলিম বিক্রেতারা পূজার ফুল-ফল ও দুধ পর্যন্ত বিক্রয় করছেন।'' ট্রাস্টির সহকারী ম্যানেজার গুলাম মহম্মদ গানিয়া জানিয়েছেন, উপত্যকায় জঙ্গি দৌরাত্ম্যের জন্যই মন্দিরের এলাকা থেকে পণ্ডিতরা চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য, ''সারা দেশ থেকে হাজার হাজার কাশ্মীরি পণ্ডিত তিনদিন ধরে ক্ষীরভবানী মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। মনে হয় তাদের ক্ষত

(এরপর ৪ পাতায়)

বামপন্থীরা বাম-রাজ্যে অ-বাম কেন?

এন. সি. দে।। ঠিক এই প্রশ্নটিই করেছিলেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের বর্তমান সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কে. এল. রেড্ডী। সম্প্রতি কলকাতা সফরে এসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, এই

বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও ত্রিপুরার বাইরে সর্বত্র শ্রমিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়া আদায়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে। এই প্রশ্নে তারা সবসময় এক শ্রমিক দরদী ভাবমূর্তি বজায় রেখে চলে। শ্রমিক স্বার্থে করা শ্রম আইন লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তারা জঙ্গি আন্দোলন করে। অন্য রাজ্যে তারা বিদেশী বিনিয়োগ, এস. ই. জেড গঠন, বহুজাতিক সংস্থাগুলির ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতির বিরুদ্ধে বিপ্লবীয়ানা দেখাচ্ছে। এ ধরনের ঘটনা ওড়িশায় ঘটেছে, হরিয়ানা, অন্ধ্রপ্রদেশেও ঘটেছে। আসলে যে যে রাজ্যে তারা দুর্বল, সেই সেই রাজ্যে তারা বি. এম. এস., আই. এন. টি. ইউ. সি' কিংবা স্থানীয় শক্তিশালী কোনও ট্রেড ইউনিয়নের সাহায্য নিচ্ছে। যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে সেইসব রাজ্যে ও কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে সরকারী কমিটিগুলিতে ঢুকে পড়ছে। নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে নিচ্ছে।

অথচ এই বামপন্থীরাই তাদের দল-চালিত রাজ্য সরকারগুলির বিরুদ্ধে কোনওরকম আন্দোলন করতে নারাজ। বাম শাসিত রাজ্য সরকারগুলি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার, খোলাখুলিভাবে বিদেশী পুঁজিকে আহ্বান জানাচ্ছে। বিদেশী শিল্পপতিদের হাতে হাজার হাজার একর কৃষিজমি তুলে দেওয়ার জন্য নিরীহ, নিরস্ত্র কৃষকদের উপরে নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে, হত্যা করছে, উৎখাত করছে, গৃহহীন ও ভূমিহীন করছে। সরকারী দপ্তরগুলিতেই যথেচ্ছভাবে ঠিকা পদ্ধতিতে শ্রমিক নিয়োগ করছে, ঢালাও বেসরকারীকরণ করা হচ্ছে। শ্রম আইনতো এই বাম রাজ্যে আদৌ আছে কিনা, তাই সন্দেহ হয়।

এদেশে শ্রমিক কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অনেক ধরনের শ্রম আইন আছে। যেমন, শ্রমিক পরিবারের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য প্রভিডেন্ট ফাণ্ড আইন, চিকিৎসা ও দুর্ঘটনার জন্য ই. এস. আই আইন, অবসরকালীন জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্র্যাচুইটি আইন, পেনসন স্কীম, বিভিন্ন ধরনের মজুরি আইন, বেতন ও বোনাস আইন প্রভৃতি। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই সমস্ত শ্রম আইনগুলি না মানার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছে। এ ব্যাপারে তারা সর্বভারতীয় স্তরে দুর্বল হওয়ায় বি. এম, এস, আই. এন. টি. ইউ সি-র সঙ্গে হাত মিলিয়ে যৌথ আন্দোলনে নেমেছে। কিন্তু শ্রম আইনগুলি সবচেয়ে বেশী লঙ্ঘিত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলি সরব নয়।

সরকারীভাবেই যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায় তা থেকেই এটা স্পষ্ট যে সারা দেশের মধ্যে এই বঙ্গেই মালিকদের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকার প্রভিডেন্ট কাণ্ড অনাদায়ি রয়েছে। শ্রমিকদের অবসরকালীন গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। মহার্ঘভাতা ও বোনাস নিয়ে

(এরপর ৪ পাতায়)

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কেশবরাও দীক্ষিত।

কলকাতায় মহারাণা প্রতাপের ৪৭১তম জন্মজয়ন্তী

সংবাদদাতা।। মেবারের ইতিহাস ও মহারাণা প্রতাপের চরিত্র ভারতবাসীর কাছে সব সময় প্রেরণার উৎস। মহারাণা প্রতাপ দেখিয়ে দিয়েছেন, যুদ্ধ শুধু উপকরণের দ্বারা নয়, সংকল্পের দৃঢ়তার কারণেই জয়লাভ করা যায়। এই কারণে ৫০০ বছর পরেও তাঁকে আমরা স্মরণ করছি। রোমানদের হাতে পরাজিত ইজরায়েল দু'হাজার বছর পরেও নিজেদের দেশ পুনরায় অধিকার করেছে। অথচ ষাট বছরের মধ্যেই আমাদের দেশের অংশ পাকিস্তান ও বাংলাদেশকে আমরা ভুলতে বসেছি।

গত ১৫ জুন কলকাতায় বেঙ্গল চেম্বারের সভাকক্ষে রাজস্থান পরিষদের আয়োজিত মহারাণা প্রতাপের জন্মোৎসবে একথা বলেন অনুষ্ঠানের বিশিষ্ট অতিথি তথা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশবরাও দীক্ষিত।

প্রতি বছরের মতো এবারও মহারাণা প্রতাপের ৪৭১ তম জন্মোৎসব পালিত হলো। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক দীনেশ বাজাজ। তিনি বলেন, রাজস্থান পরিষদের উদ্যোগে ইতিমধ্যে তিনটি কাজ হয়েছে— ম্যাকফার্সন পার্কের নাম পরিবর্তন করে মহারাণা প্রতাপ উদ্যান, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেসের নাম পরিবর্তন করে মহারাণা প্রতাপ সরণী ও সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনের সামনে ত্রিকোণ পার্কে মহারাণা প্রতাপের ২১ ফুট উঁচু ব্রোঞ্চমূর্তির প্রতিষ্ঠা।

প্রধান অতিথি হিসেবে শিলিগুড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান শ্রীমতী সবিতা আগরওয়াল শিলিগুড়িতে মহারাণা প্রতাপের প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠার আশ্বাস দেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'সম্মার্গ'-এর প্রধান সম্পাদক বিবেক গুপ্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবী রতন শাহ, পরিষদের সহ-সভাপতি যুগলকিশোর জৈথলিয়া প্রমুখ।

পরিষদের সভাপতি শার্দুল সিং জৈন স্বাগত ভাষণ দেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সংস্থার সাধারণ সম্পাদক অরুণ মল্লাবত। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রুগলাল সুরানা।

পাকিস্তানে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে হিন্দুরা

সংবাদদাতা।। পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো থাকলেও দেশের বহু-অংশে মৌলবাদী তালিবানীরাই রাজ করছে। সম্প্রতি মুসলিম মৌলবাদীদের হাতে একজন হিন্দু ব্যবসায়ী নিহত হয় এবং অপহৃত হয় এক হিন্দু ব্যবসায়ীর ছেলে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ-পশ্চিম পাকিস্তানে। রমেশ কুমার। এই ঘটনার পর বিশাল সংখ্যায় হিন্দুরা রমেশ কুমারের দেহ নিতে হাসপাতাল চত্বরে জমায়েত হয়। তাঁরা গাড়ির টায়ার জ্বালিয়ে জিন্নারোড অবরোধ করে এবং বিক্ষোভ দেখায়। আমাদের দেশে সংবাদপত্রে এই ঘটনা কোনও খবর হয়নি। যদিও ভারতে মুসলিম বিক্ষোভ সংবাদপত্রে শিরোনাম হয়। পাকিস্তানের হিন্দুরা দলবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করছে তালিবানী শাসকদের বিরুদ্ধে—এই ঘটনা সামান্য হলেও তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিজ্ঞ মহলের অভিমত।

স্বস্তিকার দাম

প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য

সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

এই সময়

অনিশ্চয়তায় এন এস জি

নিউক্লিয়ার সাপ্লায়ারস গ্রুপ (এন এস জি)-এর সদস্যপদ ভারতের জুটবে কিনা তা নিয়ে হঠাৎ-ই সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া নিউক্লিয়ার চুক্তি। যদিও কূটনৈতিক স্তরে ভারত আপামর বিশ্বকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাইছে যে ভারত-মার্কিন নিউক্লিয়ার চুক্তির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক নিউক্লিয়ার নীতি-র সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। সুতরাং এন এস জি-র সদস্যপদ তাদের প্রাপ্য। দুর্মুখেরা বলছে, এন এস জি-র সদস্যপদ পাওয়া নিয়ে হ্যাংলামো না করে ভারতের উচিৎ চীন ও পাকিস্তানের পরমাণু চুক্তি যে দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক তা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা।

রেল-দুর্নীতি

রেলের নিয়োগে বহু কোটি টাকার দুর্নীতি চক্রের চার পাণ্ডাকে গ্রেপ্তার করল সিবিআই। এর মধ্যে একজন রায়পুরের সিনিয়র ভিডিশানাল পার্সোনেল আধিকারিক এবং একজন এ ডি আর এম স্তরের আধিকারিকও আছেন। যদিও গ্রেপ্তার হওয়া এই দুই-ব্যক্তিই বলেছেন যে রেলে নিয়োগ সংক্রান্ত বহু-কোটি টাকার দুর্নীতি-তে তাদের কোনও হাত নেই। তারা যা করবার করেছেন ওপর মহলের নির্দেশেই। রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের (মুম্বাই) চেয়ারম্যান এস এম শর্মার নাম তো এতে জড়িয়েছেই, উপরন্তু সিবিআই মনে করছে রায়পুরের প্রাক্তন এডিআরএম এ কে জগন্নাথম এই দুর্নীতি চক্রের মূল পাণ্ডা। রেলের আধিকারিক ও কর্মীদের আর্থিক ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্য দিতে মমতা ব্যানার্জী বহু কিছু করেছেন, কিন্তু ওপর মহলের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পাল্টাতে পারেননি— এই ঘটনা সেটাই প্রমাণ করল।

যুদ্ধবিরতির নিয়মলঙ্ঘন

একমাসে দু'বার। যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত যাবতীয় নিয়মলঙ্ঘন করল পাকিস্তান। গত ২১ জুন জম্মুর কাছে আন্তর্জাতিক সীমারেখা বরাবর আর এস পুরায় গোলাবর্ষন করে পাক-সেনাবাহিনী। সংবাদসংস্থা সূত্রে খবর পাকিস্তান সেনাবাহিনী ওখানে আই ই ডি (ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইজ) পর্যন্ত বসিয়েছে। বি এস এফের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে— 'ওইদিন বিকেলে চারটে নাগাদ জম্মু থেকে ৩৫ কিমি দূরে অবস্থিত আবদুল্লিয়ান পোস্টে আচমকাই এলোপাথারি গুলি ছোঁড়ে পাক-সেনা। তবে ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।' একটু ধাতস্থ হয়ে পাল্টা গুলি চালায় বি এস এফও। ইতিপূর্বে গত ২৩ মে পুঞ্চ সেক্টর সহ ছ'টি ভারতীয় পোস্টে একইভাবে যুদ্ধবিরতি-র নীতি লঙ্ঘন করে গুলি চালিয়েছিল পাক-সেনা।

এবার লক্ষ্য নেপাল

খুব শিগগিরই মৌলবাদীদের টার্গেট হতে চলেছে নেপাল। সম্প্রতি ইঙ্গিত মিলেছে সেরকমই। সেখানে একটি স্কুলপাঠ্য বই-এ পয়গম্বর মহম্মদ-কে নারী রূপে দেখিয়ে একটি স্কেচ আঁকা হয়েছিল। তাতে বেজায় চটে যায় মুসলিমরা। সেই প্রতিবাদে ভীত-সন্ত্রস্ত নেপাল সরকার গত ২১ মে ওই স্কুল পাঠ্য-পুস্তকটিকে নিষিদ্ধ করে। মাওবাদীদের সহযোগিতায় সেদেশে ইতিমধ্যেই মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলো ঘাঁটি গেড়েছে। সেখানে প্রশাসনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মৌলবাদকে এমনভাবে প্রসারিত করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে যারাই সেদেশের সরকারে আসুক না কেন তারা মৌলবাদীদের কথা শুনে চলতে বাধ্য থাকবে। বিশেষত ভারতকে আক্রমণ করবার জন্য নেপালে একটা আশ্রয়ের দরকার ছিল তাদের। পাঠ্যপুস্তকে 'পয়গম্বর মহম্মদ'কে অপমান করবার প্রতিবাদে মৌলবাদীদের আন্দোলন ও নেপাল সরকারের পশ্চাদ্‌পসারণ সেই চাহিদা মিটিয়ে দিল।

গরমে পশু মৃত্যু

মধ্যভারতে এখনও চলছে দাবদাহ। বর্ষার দেখা নেই। গরমে শুধু মানুষই কষ্ট পাচ্ছে না মারা যাচ্ছে পশুরাও। এই গরমের মরসুমে তাদোবা টাইগার রিজার্ভ ফরেস্টে প্রায় শ' দুয়েক বাঁদরের মৃত্যু হয়েছে। সম্ভবত, নিদারুণ জলকষ্টেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক অনুমান। সিন্দেওয়াহি মহকুমায় যে রিজার্ভ ফরেস্টটি রয়েছে সেখানেও প্রচণ্ড গরমে ডি-হাইড্রেশন হয়ে অনেকগুলি বাঁদরের মৃত্যু হয়েছে। তাদোবা বনাঞ্চলের 'বাফার জোন'-এ একফোঁটা জল না পেয়ে বাঘেরা প্রায় মরণাপন্ন হয়ে গিয়েছিল। শেষ অবধি বনদপ্তর তাদোবা, তেলিয়া এবং কোলসা হ্রদ থেকে চারটি ট্যাঙ্কারের মাধ্যমে জল এনে কোনওক্রমে পশুগুলোকে বাঁচাল। মানুষের সাথে সাথে পশুরাও এখন সতৃষ্ণ নয়নে আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে।

সৌর বিদ্যুতায়ন

ছ' মাসের মধ্যেই সৌর বিদ্যুতায়ন নিয়ে কয়েক ধাপ এগোল ভারত। কেন্দ্রীয় নতুন ও পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী ফারুক আবদুল্লা সম্প্রতি সূচনা করলেন ভারতের বৃহত্তম সোলার ফটোভোলটিক প্লান্টের। ব্যাঙ্গালোর থেকে মাত্র আশি কিলোমিটার দূরে ইয়েল্লাসান্দ্রা গ্রামে ২৩ ওয়াট ক্যাপাসিটির ১৩,৩০০ সোলার প্যানেল নিয়ে ৩ মেগাওয়াট শক্তিসম্পন্ন সোলার পাওয়ার প্লান্ট গড়ে উঠবে। কর্ণাটক পাওয়ার কর্পোরেশনের ১৫ একর জমির ওপর ৫৯ কোটি টাকার প্লান্টটি গরমের সময় ৫ লক্ষ ইউনিট বিদ্যুৎ দিতে পারবে। যার মাধ্যমে গোটা কুড়ি গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছন যাবে অনায়াসেই। ন্যাশানাল সোলার মিশন ২০২২ সালের মধ্যে ২০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করেছে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

ভূপাল গণহত্যার দায় কী সরকারের?

শেষ পর্যন্ত যাহা আমরা ভাবিয়াছিলাম তাহাই হইল। পরমাণু দায়বদ্ধতা বিল সম্পর্কে আমরা বলিয়াছিলাম এই বিল পাশ করানো উচিৎ নয়। কারণ পরমাণু বিপর্যয় ঘটিলে তাহার ক্ষতিপূরণের সমস্ত দায় যদি পরমাণু চুল্লী সরবরাহকারীদের উপর আইন অনুযায়ী চাপানো না যায়, তাহা হইলে পরমাণু উদ্ভূত সামাজিক, প্রাকৃতিক ও মানব বিপর্যয়ের সমস্ত দায় চাপিবে সরকারের উপর। কারবারের অলিখিত নিয়ম হইল কারবারের ঝুঁকি অর্থাৎ পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি পুঁজিপতিদেরই লইতে হয় এবং তাহাকেই ইংরাজিতে বণিক ইংরাজেরা বলিয়া থাকে 'এন্টারপ্রেণারশিপ'। তাহা হইলে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সাহেবদের এই বায়না কেন? তাহা আবার যে সে বাণিজ্য নয়! একেবারে পরমাণু মারণাস্ত্র সরবরাহের বাণিজ্য পরিবেশ বাঁচানোর নামে কয়লার সাহায্যে বিদ্যুৎ তৈরির তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করিয়া, কয়লা-সমৃদ্ধ ভারতকে সাহেবদের বণিকপ্রধান দেশগুলি বাধ্য করিতেছে তাহাদের বাতিল পরমাণু চুল্লী গ্রহণ করিতে অর্থাৎ বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া কিনিতে। ওই ধূর্ত বণিকরা ভাল করিয়াই জানে ওই সমস্ত চুল্লী হইতে ব্যাপক বিপর্যয় ঘটিবেই। সেই কারণেই কোনরকম দায়বদ্ধতা ছাড়াই পরমাণু বিলটি তাহাদের বংশবদ কংগ্রেস সরকারের মাধ্যমে পাশ করাইতে ধূর্ত বণিকের দল এত উন্মুখ। যদি বিলে এই ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার কড়া দাওয়াই না থাকে, তাহা হইলে অর্থ পিশাচের দল যে কোনওভাবেই ক্ষতিপূরণ করিতে স্বেচ্ছায় অগ্রসর হইবে না তাহা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। সেই আশঙ্কাই আমরা করিয়াছিলাম। ভূপাল গ্যাস বিপর্যয়ের উপর আদালতের রায় প্রকাশিত হইবার পর এই আশঙ্কাই সত্যে প্রমাণিত হইয়াছে। অর্থ, প্রতিপত্তি, বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক দাপটের ফলে আইন, আদালত, প্রশাসনকে কব্জা করিয়া ইউনিয়ন কার্বাইডের চেয়ারম্যান অ্যাণ্ডারসন সাহেব আমেরিকায় পিঠটান দিয়াছেন আর ভূপাল মামলার সিবিআই-র দেওয়া চার্জশিটে উল্লিখিত আইনের ধারাগুলিও বদল হইয়া লঘু হইয়া গিয়াছে। গণহত্যার ধারাটি বদল করিয়া যে ধারাটি দেওয়া হইয়াছে সেটি একান্তই মামুলী—মোটর দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে লাগু হইবার যোগ্য ধারা। ফলে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে। গণহত্যাকারীদের জেল হইয়াছে দু-বছরের আর জেলের সঙ্গে সঙ্গে বেলও হইয়া গিয়াছে। ২৬ বছর বাদে কুম্ভীরাশ্রু বা বেশি আর্থিক ক্ষতিপূরণের তাগিদ কেন— ইহার পিছনে কাহাকে আড়াল করিবার গূঢ় চক্রান্ত? এই প্রশ্ন জনমনে উঠিতেছে।

সবই চলিতেছিল পরিকল্পনা মাফিক। কিন্তু এই রায়ের বিরুদ্ধে এবং তৎকালীন রাজ্য ও কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকারগুলির বিরুদ্ধে যেভাবে গণরোষ দেখা দিয়াছে সেই গণরোষকে সামাল দেওয়ার জন্য কেন্দ্রের বর্তমান কংগ্রেস সরকার আমাদের আশঙ্কাকেই সত্যে পরিণত করিয়া প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার ক্ষতিপূরণ প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে পরিকল্পনা কমিশন। এই ঘোষণাটি এতটাই পরিকল্পিত যে গ্যাস দুর্ঘটনা লইয়া মন্ত্রীগোষ্ঠীর পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকের আগেই যোজনা কমিশন এই প্যাকেজ ঘোষণা করে। এক শীর্ষ নেতার কথায় "সর্বোচ্চ আদালতের রায়েই বলা হয়েছিল যে সরকার চাহিলেই অতিরিক্ত ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করিতে পারে।" সবই যেন কেমন পরিকল্পিত পরিকল্পিত মনে হইতেছে না? মার্কিন জল্লাদের ব্যবসা করিয়া মুনাফা করিবে আর আমাদের দেশের সরকার জনগণের নিকট হইতে সংগৃহীত বিপুল অর্থ তাহাদের অপকর্মের জন্য ব্যয় করিবে কেন? শোনা যাইতেছে ইউনিয়ন কার্বাইডের গড়িয়া তোলার বহু বৎসরের নরক সাফ করিবার জন্যও অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থের এলাকাটিও বড় কম নয়। ইহার বিস্তার ৬৭ একর। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাণ্ডারসনকে ফিরাইয়া আনিবার নাটকের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে। ইহা আর কিছু নয় ছাড়িয়া ধরিতে ছোটার মতো আর কি? যেমন পুলিশ প্রায়ই করিয়া থাকে।

এখন প্রশ্ন হইল বিদেশী বণিকগণ এদেশ লুটিতে আসিবে আর আমাদের দেশের কাজ কী কেবল তাহাদের বর্জ্য পদার্থে পরিপূর্ণ মাঠ সাফ করা? তাও আবার জনগণের দেওয়া অর্থে। এ কাজ অবিলম্বে বন্ধ করা দরকার। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার আসলে ক্ষতিপূরণের টোপ দিয়া জনগণের রোষ চাপা দিতে এই কাজ করিতে উদ্যত। ইহাও কি অন্তরাত্মার আহ্বানে?

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

জাতির জীবনে একাধিকবার বহু কঠিন সমস্যা দেখা দেয়। গুরুতর সংকটের আবির্ভাব হয়। বিপদের ভয়াবহতা দেখিয়া দেশের অনেক লোক ভাবে এই বুঝি সব গেল। সমগ্র জাতির ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু, অনেক জাতি এইরূপ জীবন-মরণ সংকট হইতেও পরিত্রাণ পাইয়া আবার শক্তি ও সমৃদ্ধির আসনে উপবিষ্ট হইয়াছে। যে জাতির চরিত্রবল যত বেশি, সে জাতিই সংকটকালে অবসন্ন হয় না।

—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ভদ্রকালীর উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান না হলে ব্যাপক গণ-আন্দোলনের আশংকা

অসিতবরণ ঠাকুর

রাজ্য সরকার হুগলীর "ভদ্রকালী মহিলা ক্যাম্প" নামে খ্যাত যে পূর্ববাংলার উদ্বাস্তু কলোনী ১৯৫০ সালে ৫০০ উদ্বাস্তু বিধবা মহিলা নিয়ে চালু করে তা আজ রাহুগ্রাসের সম্মুখীন। সিপিএম মদতপুষ্ট প্রোমোটার পুঁজিপতিরা রাজ্য সরকারের অপদার্থতা বা অবহেলার (ষড়যন্ত্র নয় তো?) সুযোগ নিয়ে বর্তমানে বসবাসকারী ২৭৬টি উদ্বাস্তু পরিবারের প্রায় ২ হাজার অসহায় মানুষদের কলোনীর ২৩ বিঘা জমি থেকে আইনের মারপ্যাঁচে উচ্ছেদের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। ওই জমিতে লিজ দলিলের দাবীতে উদ্বাস্তুরা আজ বাধ্য হয়ে মরণপণ আন্দোলনের পথে! ইতিমধ্যে বহু বুদ্ধিজীবী, বিদ্বজ্জন, মানবাধিকারকর্মী ও গণসংগঠন এই অন্যায়, অবৈধ, অনৈতিক ও অমানবিক উচ্ছেদ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে আন্দোলনরত উদ্বাস্তুদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। দৈনিক স্টেটসম্যানের ১১ জুন, ২০১০-এ প্রকাশিত পুলক নারায়ণ ধর ও ডঃ প্রদীপ কুমার দত্তের নিবন্ধ দুটিতে বিশদভাবে ঘটনা ও ষড়যন্ত্রের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

আমরা ইতিহাসে জেনেছি মোগল সম্রাটদের কুশাসনে ও অপদার্থতায় স্থানীয় মোড়ল-মাতববরেরা কিভাবে মাথাচাড়া দিয়ে দুর্দান্তপ্রতাপ মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল। সিপিএম-এর ৩৩ বৎসরের ধারাবাহিক অপশাসনে ও অপদার্থতায় আজ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি দেখতে পাচ্ছি। সিপিএম-এর 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' নীতিতে সইফুদ্দিন চৌধুরী বা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়দের পার্টি থেকে বহিষ্কার করা গেলেও আজ আর সিপিএম পার্টির ওই নীতি প্রয়োগ করে অপকর্মে লিপ্ত নেতা-নেত্রীদের বহিষ্কার করার ক্ষমতা নেই। সিপিএমে আজ 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার' নীতির পরিবর্তে 'গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রিকতা' নীতি অলিখিতভাবে চালু হয়েছে। সুতরাং ভদ্রকালীর উদ্বাস্তু কলোনীর জমি, 'নাফার' ভাগের বিনিময়ে, প্রমোটারের হাতে তুলে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে স্থানীয় কমরেড নেতা-বিধায়করা জড়িত থাকলেও, ড্যামেজ কন্ট্রোলের জন্য বুদ্ধ-বিমানরা তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস দেখাতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কমিউনিস্টরা চিরদিনই সুযোগ সন্ধানী ও অসহায় মানুষদের রাজনৈতিক দাবার বড়ে হিসাবে ব্যবহার করে। কাজ মিটে গেলে তাদের আস্তাকুড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। কমিউনিস্টরা ক্ষমতা লোভে রাষ্ট্রচেতনাহীন ও অবিবেচনাপ্রসূত 'জাতিসত্ত্বা তত্ত্বের' প্রবক্তা হয়ে 'দ্বি-জাতি তত্ত্বের' ভারতভাগে মদত দিয়ে যে অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার কুফল আজ সিপিএম, মুখে স্বীকার না করলেও, হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। পূর্ববাংলার উদ্বাস্তুদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে তাঁদের রাজনৈতিক খাদ্য হিসাবে পরিণত করে ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু ক্ষমতায় বসেই ১৯৭৮-৭৯ সালে মরিচঝাঁপিতে গণহত্যা করতে পিছপা হয়নি। এতদিন ধরে সমস্ত উদ্বাস্তু কলোনীতে 'পার্টির কলোনী কমিটি'র মাধ্যমে তাদের দলদাস হিসাবে ব্যবহার করে ভোটার হিসাবে কাজে লাগিয়েছে মাত্র, কিন্তু তাদের মূল সমস্যার স্থায়ী সমাধানে সাহায্য করেনি। বরং বিরোধিতাই করেছে। উদ্বাস্তু কলোনীতে পার্টির নিয়ন্ত্রণ কমে যাবার ভয়ে তারা কলোনীর জমিতে লিজ দিতে বিরোধিতা করেছিল। তা সত্ত্বেও, নিজে উদ্বাস্তু না হয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় একক প্রচেষ্টায় ও আন্দোলনে প্রয়াত রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রীত্বের সময়ে উদ্বাস্তুরা কলোনীর জমির লিজ দলিল পাওয়ার অধিকারী হয়।

বহু উদ্বাস্তু কলোনীর বাসিন্দারা লিজ দলিল পেয়েছেন ও পাচ্ছেন। কিন্তু কি কারণে ১৯৫০ সালের রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত ভদ্রকালী উদ্বাস্তু কলোনীর বাসিন্দারা আজও নিজ দলিল থেকে বঞ্চিত হয়ে আছেন তা পরিষ্কার নয়। সরকারের মালিকানায় নেওয়ার জেলাশাসকের Land Acquisition-এর নোটিস বেরনোর পরেও কেন তা বাতিল বা স্থগিত হল তা বোঝা যাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন নেই এটা একটা অজুহাত মাত্র বলেই মনে হয়। এর পেছনে অন্য গল্প আছে কিনা তা খুঁজে বের করা দরকার। রাজ্য সরকারের মান সম্মান বাঁচাতে উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধানে মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ দরকার। বিরোধী জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষ করে স্থানীয় বর্তমান তৃণমূল সাংসদ বিশিষ্ট আইনজ্ঞ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে উদ্বাস্তু বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি. চিদাম্বরমের হস্তক্ষেপে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব।

অন্যান্য গণসংগঠনের সমর্থনের পাশাপাশি 'অল ইন্ডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট' ইতিমধ্যে অবৈধ ও অমানবিক উচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে তাদের স্বস্থানে জমি লিজ দলিল দিয়ে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার দাবী জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব প্রমুখদের কাছে দাবীপত্র পাঠিয়ে আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।

সিপিএম সরকার উদ্বাস্তুদের উপর এই ধারাবাহিক অত্যাচার, হয়রানি, শোষণ করে তাদের প্রাপ্য নাগরিকত্ব ও পুনর্বাসনের অধিকার বঞ্চিত করে আর কতদিন চালাবে? মরিচঝাঁপির গণহত্যার বিচার হবে না? মরিচঝাঁপি-উৎখাত উদ্বাস্তুসহ পুনর্বাসন বঞ্চিত রাস্তা-ঘাটে পড়ে থাকা পূর্ববাংলার বে-নাগরিক উদ্বাস্তুরা সব আজ একজোট হয়েছে ও হচ্ছে। এই অন্যায়, অনৈতিক, অসাংবিধানিক ও অমানবিক ব্যবহারের পরিণতিতে সিপিএম ও তার লেজুড় পার্টিতে ধস নেমেছে। উদ্বাস্তুরাই বামেদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। তারাই পারে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে বঙ্গোপসাগরে ডুবাতে—যা কংগ্রেসের বরকত সাহেবরা ঘোষণা করেও পারেনি। ২০০৬ সালে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে হার্মাদ-পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ভোট আদায় করা গেলেও এবার কিন্তু তারা অনেক সজাগ এবং অধিকার সচেতন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আগের কৌশলে আর ফল মিলবে না।

বাংলার জননেত্রী উদ্বাস্তুদের ক্ষমতা ভালভাবেই বুঝেছেন। তাই তিনি মতুয়া মায়ের কাছে গেছেন ও বারে বারে যাচ্ছেন ও তাঁর আশীর্বাদ চাইছেন। তবুও বলি বহু দাবীপত্র দেওয়া হলেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করার কথা আজও জনসমক্ষে ঘোষণা করেননি। এটা খুবই জরুরী, অন্তত বিধানসভা ভোটের আগে। প্রায় সবাই আস্তে আস্তে সিপিএম বিরোধী শিবিরে যোগ দিচ্ছেন। সিপিএম সমস্যার সৃষ্টি করে ফায়দা লুটতে পারে, কিন্তু সমাধান করতে জানে না বা চায় না। কেন না সমস্যা থাকলেই লোক তাদের পার্টিতে আসবে। ৩৩ বৎসরের অপকর্মের সমস্যার পাহাড় তারা নিজেরাই তৈরি করেছে। কিন্তু তার সমাধান করা আজ তাদের ক্ষমতার বাইরে। জটিল সমস্যার চক্রব্যূহে তারা বন্দি হয়ে হাঁস্‌ফাস্‌ করছে। তা থেকে বেরোনোর কোনও রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। এত বছরের রাজত্বে বহু 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন' তৈরি হয়েছে। সৃষ্টিকর্তাকেই 'ফ্রাঙ্কেনস্টাইন'রা মারে। সব কমিউনিস্ট দেশেই তাই হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অন্যথা হবে কি করে? তাই সাধু সাবধান।

ভদ্রকালীর উদ্বাস্তুদের অধিকার মেনে নিয়ে এখনই কোনও সমাধান করতে বুদ্ধবাবুরা ব্যর্থ হলে এই উদ্বাস্তু গণআন্দোলন নন্দীগ্রামের প্রতিরোধ আন্দোলনের চাইতেও অনেক ব্যাপক রূপ নিয়ে সারা বাংলায় ছড়িয়ে পড়বে এবং আগামী বিধানসভা ভোটে বিরোধী ঝড়কে সুনামিতে পরিণত করে সিপিএম পার্টির মৃত্যুশয্যার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেবে।

উদ্বাস্তুরাই বামেদের ক্ষমতায় বসিয়েছিল। তারাই পারে তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে বঙ্গোপসাগরে ডুবাতে—যা কংগ্রেসের বরকত সাহেবরা ঘোষণা করেও পারেনি। ২০০৬ সালে উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে হার্মাদ-পুলিশ বাহিনী লেলিয়ে দিয়ে ভোট আদায় করা গেলেও এবার কিন্তু তারা অনেক সজাগ এবং অধিকার সচেতন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আগের কৌশলে আর ফল মিলবে না।

কেন্দ্রীয় সরকারের দীর্ঘসূত্রতায় দেশের অনেক ক্ষতি হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ যে সকল আইনের আশু প্রয়োজন, তা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এদেশে কেন্দ্রীয় সরকারের অযৌক্তিক দীর্ঘসূত্রতা দেখা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কোনও রাজনৈতিক দলই ব্যতিক্রম নয়। অথচ প্রচণ্ড ক্ষতি রুখতে ওই আইন যুদ্ধ কালীন তৎপরতার ভিত্তিতে পাস করানো প্রয়োজন ছিল।

এরকম ঘটনার সর্বশেষ উদাহরণ হলো, ভূপাল গ্যাস-লিক ঘটনা। সম্প্রতি আদালতের রায়ের পর দেখা গেল, আমাদের দেশের আইনই পাকা-পোক্ত নয়। যথেষ্ট দুর্বল। ভূপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় গ্যাস-লিকের ফলে প্রায় পঁচিশ হাজার নিরীহ মানুষ বেঘোরে মারা গিয়েছিল—১৯৮৪ সালে। তাদেরকে হত্যার মামলার রায় বেরোল দীর্ঘ ২৬ বছর বাদে। শুরু হয়েছে চাপান-উতোর। গঠিত হয়েছে মন্ত্রীস্তরীয় কমিটি। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, ৮০-র দশকে যখন ওই ঘটনা ঘটেছিল তখনই মন্ত্রীগোষ্ঠী বা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়নি কেন?

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কর্মক্ষেত্রে (work place) মহিলাদের যৌন হেনস্থা। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার অন্ততপক্ষে ১৩ বছর পর সুপ্রীম কোর্ট একটি 'কোড' ঘোষণা করে। এবং রুল জারি হয়— কোনও আইন যতক্ষণ না পাশ হচ্ছে ততক্ষণ অবধি ওই 'কোড'-ই আইন হিসাবে গ্রাহ্য হবে। 'কোড' ঘোষণার ১৩ বছর পরই সরকার আইন প্রবর্তনে প্রবৃত্ত হয়। তাই বলে সরকার কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্থার বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ ছিল—এটা বলা যায় না। ১৯৮০ সালের ৩০ জুলাই তারিখে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে গৃহীত এক এই প্রস্তাব মোহর লাগানো হয়েছিল। রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৭৯-তেই এটিকে গ্রহণ করা হয়েছিল। তখন তাকে ইংরেজীতে 'Conevention on Elimination of All Forms Discrimination Against Women'—বলা হয়েছিল। ভারতে এটি কার্যকর হয় ১৯৯৩-এর ৯ জুলাই। আন্তর্জাতিক আঙিনায় যখন কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতি বৈষম্য নিয়ে হুলস্থূল তখনই আবার ভারতে কি সরকারি কি বেসরকারি

কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হয়রানির ব্যাপারটা উঠে এসেছে।

এই বিষয়ে বিগত ১৯৯৭ সালের ১৩ আগস্ট বিশাখা বনাম রাজস্থান সরকারের মামলায় মাননীয় প্রধান বিচারপতি জে এস ভার্মা, বিচারপতি সুজাতা মনোহর এবং বিচারপতি বি এন কৃপাল-এর এক ডিভিশন বেঞ্চ যুগান্তকারী রায় দিয়েছেন। ওই রায়ে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগকর্তাকে সহানুভূতিশীল এবং প্রতিশোধমূলক ব্যবহার থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে যৌন হেনস্থার ঘটনার দ্রুত পঞ্জিকরণ এবং বিচার প্রক্রিয়া শুরুর ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই রায়ে ভারত সরকারের মহিলা অধিকার রক্ষার ব্যাপারে ১৯৫৬ সালে বেজিং-এ মহিলা সম্পর্কিত চতুর্থ বিশ্ব সম্মেলনে ঘোষিত স্বীকৃতিকেই যেন ব্যঙ্গ করা হয়েছে। ওই সম্মেলনে মহিলাদের অধিকার সম্পর্কিত জাতীয় নীতি, কমিশন বা সংস্থার মাধ্যমে সারা দেশে এক সুষ্ঠু ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছেলি। যে ব্যবস্থা একটি মঞ্চ হিসেবে মহিলা-অধিকার রক্ষার্থে কাজ করবে।

ওই রায়ে বিচারপতিরা আরও বলেছিলেন, 'উপরোক্ত গাইডলাইন এবং নীতি কঠোরভাবে সকল কর্মক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে। নারী-পুরুষভেদে কোনওরকম বৈষম্য যেন না হয়। এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত আইন প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত এই নির্দেশ কার্যকর হবে।'

যে কোনও দেশের সরকারই এরকম ঘটনায় সংবিধান সভার বা সংসদে আইন প্রণয়নে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা নিত। একথা আর বলার দরকার পড়ে না। অথচ আমাদের দেশে বছরের পর বছরের প্রতীক্ষা করা এবং কোর্টের রায়কেই শেষপর্যন্ত আইনের মর্যাদা দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে।

১৯৯৭ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ বছর বাদে আইন পাস হবে বলে আশা করা যেতে পারে। এবং মহামান্য আদালতের নির্দেশে সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিরোধিতার মতো বাধা এক্ষেত্রে হবে না।

ঐতিহাসিক রামকেলী মেলা

তরুণ কুমার পণ্ডিত ঃ মালদা ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিবিজড়িত প্রাচীন ও ঐতিহাসিক রামকেলী মেলা শেষ হয়ে গেল ২০ জুন। মালদা জেলার বাংলার প্রাচীন রাজধানী গৌড়ে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির দিন থেকে এই মেলা হয় চলে ৫-৬ দিন ধরে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদার্পণকে কেন্দ্র করে তার আগমনকে স্মরণীয় করে রাখতেই প্রতি বছর রামকেলীতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে এই মেলা বসে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসাম, বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বৈষ্ণব তীর্থযাত্রীরা এই মেলাতে আসেন। আর অন্য কোথাও কোনও মেলাতে এত বেশী বৈষ্ণব ভক্তের সমাগম দেখা যায় না। তাই এই মেলার পরিচিতি বৈষ্ণব মেলা হিসাবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শকাব্দ ১৪৩৭, ইংরেজী খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের কোনও এক সময়ে ভক্তগণ পরিবৃত হয়ে হরিসংকীর্তন করতে করতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এখানে এসেছিলেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লক্ষ্যস্থল বৃন্দাবনধাম। তিনি নীলাচল থেকে পানিহাটি পর্যন্ত নৌকাপথে আসেন। সেখান থেকে কুমারহট্ট, ফুলিয়া প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করে রওনা হন মালদা জেলার গৌড়ের দিকে। সেদিন জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি তিথি। সপার্ষদ রামকেলী গ্রামে উপস্থিত হলেন মহাপ্রভু। এখানে অবস্থান করলেন বেশ কয়েকদিন। সেদিন বাংলার রাজধানী গৌড়ের উপকণ্ঠে অবস্থিত রামকেলী গ্রাম বৈষ্ণবদের কীর্তনে মাতোয়ারা হয়েছিল। তদনীন্তন গৌড় বাদশা হুসেন শাহ ভয় পেয়েছিলেন, হয়তো নবীন এই সন্ন্যাসী কেড়ে নেবে তার রাজ্যপাট। রাজপ্রাসাদের শীর্ষে দণ্ডায়মান হয়ে গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ দেখছেন খোদাতালার সাক্ষাত দূত হয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর কীর্তন বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন রাজপ্রসাদের দিকে।

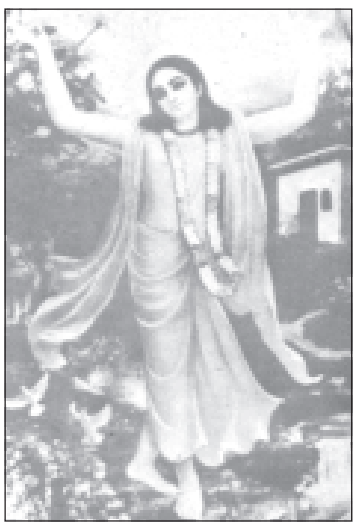

চৈতন্যদেব বিনাবাধায় রাজঅন্তঃপুর পরিভ্রমণ করে কীর্তন বাহিনী নিয়ে ফিরে এলেন রামকেলী ধামে। এরপরই মহাপ্রভু রামকেলী ত্যাগ করেন। কিন্তু রেখে গেলেন তাঁর পদচিহ্ন। আজও বৈষ্ণব ভক্তদের কাছে তমাল গাছের তলে 'সেই পদচিহ্ন' পুষ্প ও গঙ্গাজল দিয়ে পুজিত হয়ে আসছে। এছাড়াও এই জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের ভক্তরা রামকেলী থেকে দেড় কিমি দূরে শ্রীশ্রী গয়েশ্বরীকালী দেবীর আদি বিগ্রহে স্বর্গগতা মাতৃদেবীর পিণ্ড দান করতে ভীড় জমান। ফলে তাদের এক সাথে মেলা দেখা ও মাতৃকুলের পিণ্ডদান দুটোই হয়ে যায়। রামকেলী মেলা প্রাচীন মদনমোহন মন্দিরকে কেন্দ্র করেই বসে। যেহেতু এবছর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ৫২৫ তম জন্মজয়ন্তী বর্ষ চলছে বৈষ্ণব ভক্তের ভীড় এবার প্রচণ্ড হয়েছিল। অথচ মেলায় আগত পুণ্যার্থীদের সুযোগ সুবিধার প্রতি তেমনভাবে নজর দেওয়া হয় না। ফলে বাউল, বৈষ্ণবভক্ত ও সাধু সন্ন্যাসীদের রাত কাটাতে হয় খোলা আকাশের নীচে। শৌচালয় ও অসুস্থ হলে অস্থায়ী হাসপাতালের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীরা প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হন। মেলা পরিচালন কমিটির সম্পাদক অরুণ দাসের বক্তব্য, এত বড় একটি ঐতিহাসিক গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও কেন জেলা পরিষদ বা জেলা প্রশাসন মেলাটির প্রতি তেমন নজর দেয় না তা বোধগম্য হয় না। কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা যেমন সত্য সাঁই সমিতি, স্থানীয় ক্লাব পুণ্যার্থীদের সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে। আর এই মেলা থেকেই বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধু সন্ন্যাসীরা সোজা অসমের কামাক্ষ্যা মন্দিরে চলে যান পূজা দিতে অম্বুবাচিতে। মালদাতে এবার প্রচুর আম হয়েছিল। বৈষ্ণব ভক্ত ও সাধুসন্তরা খুব কম দামে ও ভিক্ষা করে আম খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন।

কাজ শুরু হচ্ছে রোটাং সুড়ঙ্গের

(১ পাতার পর)

উচ্চতায় ৫ কিমি দীর্ঘ সুড়ঙ্গ। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশনের তত্ত্বাবধানে শুরু হওয়া এই সুড়ঙ্গটি আগামীদিনে ভারতবর্ষের কূটনৈতিক কৌশলগত অস্ত্রে পরিণত হবে। সেদিক দিয়ে বিচার করলে স্টারবাগ কোম্পানীর কাজ যথেষ্ট চ্যালেঞ্জিং। যদিও ১৩ হাজার ফুট উচ্চতায় এহেন সুড়ঙ্গের কাজও তাদের কাছে প্রথম নয়। কারণ পৃথিবীর বহু উঁচু স্থানে ইতিপূর্বে কাজ করার বিস্তর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের।

এই সুড়ঙ্গটি তৈরির পেছনে প্রায় তিন দশকের ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। মানালি, সারচু, লেহ বছরের অধিকাংশ সময়েই বরফাবৃত থাকায় ওখানে একটি সুড়ঙ্গের প্রয়োজনীয়তার কথা ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই সরকারের মাথায় এসেছিল। এরপর '৮৪-তে এ নিয়ে প্রাথমিক 'স্টাডি' করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে '৮৭-তে রাজীব গান্ধীর সময়ে বর্ডার রোডস ডেভলপমেন্ট বোর্ডের একটি বৈঠকে এটিকে অনুমোদনও দেওয়া হয়। এরপর দীর্ঘ একযুগের নীরবতা। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলেই ওই সুড়ঙ্গ পথটি গড়ার প্রথম কার্যকরী প্রকল্প নেওয়া হয়। ততদিনে অবশ্য কার্গিল যুদ্ধ ঘটে গেছে। এরপর আরও এক যুগের অপেক্ষা। অবশেষে শুরু হতে চলেছে রোটাং সুড়ঙ্গের কাজ। প্রকল্পটি গৃহীত হবার পর তা রূপায়ণ হতে আরও একযুগ লাগল কেন, তা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে।

পণ্ডিতদের 'নতুন কাশ্মীর'

(১ পাতার পর)

কিছুটা শুকিয়েছে।"

দশ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত ক্ষীরভবানী মন্দিরে অন্তত কয়েক ডজন মুসলিম কর্মচারী রয়েছেন বলে গানিয়া জানিয়েছেন। এরমধ্যে মালি, ঝাড়ুদার থেকে শুরু করে রক্ষী— সবাই রয়েছেন। তারাও নাকি পণ্ডিতদের অভাবটা সত্যিই অনুভব করছেন। কারণ মন্দিরের জন্য অনুদান ও প্রসাদী ফল-মূল তাদেরকেই সংগ্রহ করতে হচ্ছে।

এই তীর্থক্ষেত্রে মন্দিরটি ১৯১২ সালে মহারাজা প্রতাপ সিং গড়ে তোলেন। পরবর্তীকালে কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং এর সংস্কার সাধন এবং পুনরুদ্ধারের কাজে সহায়তা করেন। জ্যৈষ্ঠ অষ্টমী-র (মে-জুনে) পাশাপাশি শুক্লপক্ষের অষ্টমীতেও কাশ্মীরের পণ্ডিতদের বিশাল সমাগম হবে। ওইদিন যজ্ঞও সম্পন্ন হবে।

বাম-রাজ্যে অ-বাম কেন?

(১ পাতার পর)

টালবাহানা এই রাজ্যের মালিকদের একটি স্বাভাবিক প্রবণতা। এছাড়া রয়েছে নানান অজুহাতে ওয়ার্ক সাসপেনশন-এর নামে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া, রুগ্ন ঘোষণা করে রাজ্য নিয়ন্ত্রিত কারখানা ও সংস্থাগুলিকে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রমোটার চক্রের হাতে তুলে দেওয়া। এশিয়ার বৃহত্তম কাগজ কল ইন্ডিয়ান পেপার এণ্ড পাল্প লিমিটেড ও গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের জমি বিক্রি করে দেওয়া তার প্রকৃষ্ট নমুনা।

বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃত্বে রয়েছে দুর্নীতিগ্রস্ত কমিউনিস্টরা। তাই তাদের দলীয় সরকারের শ্রম ও শ্রমিক বিরোধী আচরণকে আড়াল করতে অন্যান্য বৃহৎ শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে কোনরকম যৌথ আন্দোলন এই রাজ্যের তৃণমূল স্তরে অর্থাৎ কারখানা স্তরে করতে বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলি রাজি নয়। শুধু তাই নয়, এমনকী শ্রম ও শ্রমিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোনও সরকারী কমিটিতে বি এম এস'র প্রতিনিধি রাখতেও তাদের আপত্তি। সরকারী কমিটিগুলির সভাও ডাকা হয় অত্যন্ত কদাচিৎ।

স্বাভাবিকভাবেই শ্রী রেড্ডীর মতো পশ্চিমবঙ্গের বাইরের নেতাগণের বাম ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের পরিচয় হয় তাদের বাইরের আচরণ দেখে। যখনই তারা পশ্চিমবঙ্গের খবরাখবর রাখতে শুরু করেন তখনই তাদের মনে প্রশ্ন জাগে! "বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি বাম-শাসিত রাজ্যে কেন অ-বাম?" এই প্রশ্নের একমাত্র যোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন 'ম্যাকিন্‌সে' নামক এক বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার উপদেষ্টা। তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাম সরকারের নিয়ন্ত্রণে এই রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের যথার্থ নিরুপণ করতে এসেছিলেন। তিনি তার রিপোর্টে লিখেছিলেন, "দুর্ভাগ্যজনক হলেও পশ্চিমবঙ্গকে জানার একমাত্র পথ বাস্তবতা। পরিসংখ্যান অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গের স্থান সপ্তম হলেও, শিল্প বিনিয়োগকারীদের প্রকৃত বিনিয়োগের নিরীখে এই রাজ্যের স্থান একাদশতম"। এটা অত্যন্ত লজ্জার কথা যে পশ্চিমবঙ্গ আজ এমন এক ভ্রষ্ট রাজ্যে পরিণত হয়েছে যে বাইরের মানুষরাও আজ আমাদের দেওয়া তথ্যে বিশ্বাস করে না।

বামপন্থীদের চিনতে হবে তাদের শাসিত রাজ্যের বাস্তবতা দিয়ে; তাদের আদর্শের বাস্তবতা দিয়ে নয়। তাদের রাশিয়ান নেতা লেনিন শিখিয়েছেন 'সব সময় চলবে বাস্তব অবস্থার সুনির্দিষ্ট বিশ্লেষণ করে' অর্থাৎ নিজেদের শাসিত রাজ্যে শ্রমিকদের উপর নিপীড়ন করাটা নয়, অন্য রাজ্যে শ্রমিক নিপীড়নের বিরুদ্ধে জঙ্গি বিপ্লবীয়ানা দেখানোটাই তাদের বাস্তবতা। পশ্চিমবঙ্গে আজ বামপন্থীরা বাস্তবিকভাবে অ-বাম, কিন্তু আগামী দিনে যদি বামেরা ক্ষমতাচ্যুত হয়, তাহলে এই বাংলায় তারা হয়ে উঠবে উগ্র বাম, কথায় কথায় দেখাবে বিপ্লবের পরাকাষ্ঠা। তাদের বাস্তবতা তাই সদা-পরিবর্তনশীল।

ইউ পি এ-১ নম্বর সরকারের আমলে এরা ছিল কংগ্রেসের দোসর, তাই তখন যৌথ আন্দোলনের প্রয়োজন হয়নি। এবার বামপন্থীরা ইউ পি এ সরকার থেকে বিতাড়িত, তাই যৌথ আন্দোলনের পথে এখন বামপন্থীরা। বি এম এস কিন্তু আগামী ২৯ জুন '১০ বামফ্রন্ট সরকারের শ্রম-শ্রমিক সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামছে।

রাজ্য রাজনীতি

"৩৩ বছরের" উদ্ধত সরকারের নেতাদের উপর নেমে আসছে গণরোষ গণদণ্ড

নিশাকর সোম

বামফ্রন্ট সরকার ৩৩ বছরে পদার্পণ করলো। এই সম্পর্কে আলোচনায় যাবার আগে বামফ্রন্ট সরকারের ৩২ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু জনসমাবেশে যে গণ-শপথ বাক্যটি পাঠ করান সেটা উদ্ধৃত করতে চাই— "বামফ্রন্টের ৩২ বছরে পদার্পণে আমাদের শপথ নিতে হবে, আমরা কেউ নিজের স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত নই। আমরা জনগণের স্বার্থে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছি। তাই আমাদের সমস্ত অহংবোধ ত্যাগ করে আত্মম্ভরিতা বর্জিত আলাপচারিতায় শ্রমিক শ্রেণী, শ্রমজীবী জনগণের সব অংশের গরিব মানুষের মনকে জয় করে ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের পথে অগ্রসর হতেই হবে।"

উপরের শপথের কথাগুলি আজ ব্যঙ্গ করছে বিমান বসুকে। কারণ শপথ নেওয়ার এক বছর পরেও বামফ্রন্টের নেতাদের মধ্যে অহংবোধ ও আত্মম্ভরিতা ত্যাগের কোনও লক্ষণ দেখা যায়নি। উপরন্তু অহংবোধ ও আত্মম্ভরিতা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে নেতাদের মধ্যে। বিমানবাবু নিজের কথাবার্তার মধ্যে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে "রকের ছেলেদের" ভাষা। বিমানবাবু-কে মাঝে মাঝে মনে হয়— ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন, তাই মা-মাটি মানুষ স্লোগানটাই ধরে ফেললেন। এ কথা শুনে মনে হয় বলি, সেই তো মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি? বামফ্রন্টের এই দীর্ঘ রাজত্বে কি দেখা গেল? একটা দূরবীণ ছাড়া জাহাজ। যে-জাহাজে বহু দাঁতাল ধেড়ে ইঁদুর ঢুকেছে এবং জাহাজটিকে কেটে ফুটো করে দিয়ে অতল জলের আহ্বানে পৌঁছে দিয়েছে। জ্যোতি বসু মুখ্যমন্ত্রী। তদানীন্তন সাধারণ-সম্পাদক হরকিষেণ সিং সুরজিৎ। তাঁরা রাজ্য মন্ত্রিসভার কোনও লক্ষ্য স্থির করেননি। ব্যাপারটা— 'গো-অ্যাজ ইউ লাইক' যথা অভিরুচিতে চল। রাজ্যের সবথেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিজীবী— শুধু পাট্টা বিলি করেই আত্মপ্রসাদ-আত্মশ্লাঘা। তারপরেই কৃষকদের উচ্ছেদ করে শিল্পায়নের নামে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম করে তোলা। জ্যোতি বাবুকে বুদ্ধ-বিমান-কারাত-ইয়েচুরি সরালেন। কারণ তিনি পচে গেছিলেন। জ্যোতিবাবু তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বের কালে কোনও দূরপাল্লার বা আশুকর্মসূচী রাখেননি যার ফলে বামফ্রন্ট উৎসাহ উদ্দীপনা পায়। বিপরীতে তিনি মরিচঝাঁপি, বানতলা, ধর্মতলায় গুলি চালনা প্রভৃতি অন্যায় কাজ করে এবং অহংবোধের লেলিহান শিখায় দগ্ধ করেছিলেন।

বুদ্ধবাবু এসেই ধরাকে সরাজ্ঞান করলেন, বলতে লাগলেন, আমার ২৩৫ ওরা ৩০। বিরোধীদের মাথা ভেঙে দিতে হবে। শুধু বিরোধীরা নয় শরিক দলগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনলেন না। শরিক দলগুলিও সিপিএম-কে টাইট দেবার রাজনৈতিক-কৌশল নিল। সর্বনাশ হলো রাজ্যের মানুষের।

আজ পৌরসভার নির্বাচনের পর পুলিশের নিচের তলা এবং উপর তলার একাংশ বামফ্রন্টের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে বিরোধীদের প্রতি আস্থা স্থাপন করেছেন। পুলিশ পৌর নির্বাচনে সিপিএম-কে পাত্তা দেয়নি। বিগত ৩২ বছরে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। খুন-খারাপি, ডাকাতি, রাহাজানি, মহিলা নির্যাতন দৈনিক ঘটনায় পরিণত।

আদিবাসী জনগণকে উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করার ফলে আদিবাসী জনজাতি অঞ্চলে গরীবের পার্টি হিসেবে 'মাওবাদী'রা আসর জমিয়ে তুলেছে। এরজন্য শুধুই যৌথ বাহিনী দিয়ে হবে না— উন্নয়ন-সাহায্য-সমস্যায় মাথা দেননি, দার্জিলিং পার্টির মধ্যে দু'-রকমের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো—১। পাহাড়-সমতল দ্বন্দ্ব, ২। পাহাড়ের গোর্খা-অ-গোর্খা দ্বন্দ্ব। এদিকে রতনলাল-এর বিরুদ্ধে প্রাদেশিক কমিটির সদস্য আনন্দ পাঠক প্রমুখদের বিক্ষোভ সঞ্চারিত হোল। সব মিলিয়ে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হোল। তার ফলে রতনলাল ব্রাহ্মণকে কলকাতায় পালিয়ে আসতে বাধ্য করলো। শোনা যায় রতনলালের নাকি হোটেল ছিল।

এরপর দার্জিলিং-এর দায়িত্ব দেওয়া হোল জ্যোতিবাবুকে সরিয়ে যিনি মুখ্যমন্ত্রী হলেন সেই বুদ্ধ দেব ভট্টাচার্য-কে। তিনিও জ্যোতি বসুর কায়দায় তাঁর অনুগত বন্ধুস্থানীয় অশোক ভট্টাচার্য-কে দেখার দায়িত্ব দেন। অশোকবাবু সমতলের লোক— পাহাড় গ্রহণ করলো না। অশোকবাবুর নাম অশোক 'আগরওয়াল' —এ পরিণত হল।

জ্যোতি বসুর আমলেই গোর্খা লীগ তথা সুবাস ঘিসিং সৃষ্টি হয়েছিল। ঘিসিং-কে কিছু 'কনসেশন' দেওয়া হল— ঘিসিং-সিপিএম-কে পাহাড়ে কোণঠাসা করে দেন। পরে ঘিসিং-এর করুণার উপর নির্ভর করে এগোতে লাগলেন। ঘিসিং পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা পেয়ে বেপরোয়া হলেন। —জন্ম নিল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা। নেতা হলেন— সুবাস ঘিসিং-এর ড্রাইভার বিমল গুরুং। বিমলের দাপটে সুবাস ঘিসিং-কেও কলকাতায় পালিয়ে আসতে হলো। এই অবস্থায় চলতে চলতে মদন তামাং-এর নৃশংস হত্যাকাণ্ড হলো। তখন কিন্তু পাহাড়ের অবস্থা বদলে গেল। 'প্রশাসন-পুলিশ ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারলো না।' এ কথা বললেন— অশোক ভট্টাচার্য। দার্জিলিং-এর সমস্যা বুদ্ধ বাবু-অশোকবাবুর দয়াতে জটিলতর হলো। যে চা-বাগান থেকে ১৯৪৬ সালে রতনলাল ব্রাহ্মণ জিতেছিলেন, যে চাবাগান ছিল কমিউনিস্টদের মূলশক্তি— আর আজ চা-বাগান থেকে সিপিএম-এর উপর 'হটা-বাহার' প্রথা প্রয়োগ হল। শুধু দার্জিলিং সমস্যা নয়, বিভিন্ন জেলায় কুটির শিল্পকে ধ্বংস করার ফলে কোনও সরকারি পরিকল্পনার অভাবে দারিদ্র্য বেড়ে চল্‌লো ৩২ বছর ধরে। পুরুলিয়ার লাক্ষা শিল্প ধ্বংস হলো। বাঁকুড়ার টেরাকোটা, ছৌ-মুখোস, শোলার কাজ ইত্যাদি কোনও শিল্পকে ৩২ বছরে সাহায্য করা বা উন্নয়নের কোনও পরিকল্পনা ছিল না। ছিল ভোটের সময়ে 'টাকা দাও, পচাই-এর ঢালাও ব্যবস্থা কর— ভোট নাও।' ধন্য মার্কসবাদ—মার্কস কবরে শিউরে উঠছেন। পশ্চিম মেদিনীপুরের অনুন্নত শ্রেণীকে অবহেলা করা হোল, তাইতো জঙ্গলমহল, ঝাড়গ্রাম, থেকে সিপিএম বিতাড়িত। এর উপর দীপক সরকার, সুশান্ত ঘোষ কোম্পানির বেপরোয়া অত্যাচার দরিদ্র মানুষদের ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। তার ফলেই 'মাওবাদী' শক্তির উত্থান সম্ভব হলো।

নেতারা বাড়ি-গাড়ি-বিত্ত-বৈভব করাতেই ব্যস্ত। দুঃখ-দুর্দশার প্রতি ৩২ বছরে পলক ফেলার সময় পেলো না। এদিকে '২৩৫ বনাম ৩০ তত্ত্ব' এবং 'ওরা'-'আমরা' চালু করলেন ধ্বংসকারী নেতারা। এর ফলে পার্টির নিচের তলায় লুম্পেন প্রলেতারিয়েত-এর সংখ্যা বাড়তে লাগলো, যাঁদের কাজ হল ম্যানি-মাসলম্যান দিয়ে নির্বাচনটাকে ওয়ান ডে ম্যাচে পরিণত করা। পুলিশের ভূমিকাও এই ৩২ বছরে সিপিএম-এর দিকে ঝুঁকে পড়লো। লালবাজারে পুলিশ সদর দপ্তরে জ্যোতি বসু সভা করে বললেন— "আপনারা অতীতে যেমন আমাদের জিতিয়েছেন— এবারও তাই করার জন্য বলছি।" আগে পুলিশ পরিচালনা করতো আই পি এস। ৩২ বছরে সিপিএমের আমলে পুলিশ পরিচালনার দায়িত্ব (?) নিল এল সি এস। প্রসঙ্গত উত্তর ২৪ পরগণা জেলার এক নেতার বাড়িতে এস পি-দের নাকি নিয়মিত হাজিরা দিতে হতো? পুলিশ সিপিএম সমার্থক হয়ে গেল। ফলে সিপিএম-কে মানুষ ভয় পেলেও— ভালোবাসতো না।

৩২ বছরে সবথেকে দুর্দশাগ্রস্ত স্বাস্থ্য দপ্তর। শিশুমৃত্যু হলো— ম্যালেরিয়া, পোলিও, চিকুনগুনিয়া, সোয়াই ফ্লু-এর

(এরপর ১৫ পাতায়)

> **"বুদ্ধবাবু এসেই ধরাকে সরাজ্ঞান করলেন, বলতে লাগলেন, আমার ২৩৫ ওরা ৩০। বিরোধীদের মাথা ভেঙে দিতে হবে। শুধু বিরোধীরা নয় শরিক দলগুলিকে হিসাবের মধ্যে আনলেন না। শরিক দলগুলিও সিপিএম-কে টাইট দেবার রাজনৈতিক-কৌশল নিল। সর্বনাশ হলো রাজ্যের মানুষের।"**

অন্য রকম

বেঁচে থাকার শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ২০০১ সালের সেই দিনটার কথা বোধহয় জিন্দেগীতে ভুলতে পারবেন না নগেন্দ্র সিং পরিহার। একে সদ্য আত্মঘাতী হওয়া স্ত্রীর জন্য শোক, আর এরপর মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে, সেই স্ত্রী-র হত্যাকারী বলে তাকেই গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তার বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে ৪৯৮-এ ধারায় বধূ-নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হলো। গ্রেপ্তার করা হলো তাদেরও। পরের বছর আগস্টে শাহদল ট্রায়াল কোর্টে ছাড়া পেয়ে গেলেন নগেন্দ্র-র বাবা-মা। কিন্তু ছাড়া পেল না নগেন্দ্র। জেলের চার-দেওয়ালের ঘেরাটোপ কখনও কখনও অসহনীয় হয়ে ওঠে। একটুখানি মুক্তির আস্বাদ পেতে চায়। বারে বারে মনে হয়— এ বিচার নয়, এ প্রহসন। আমি তো কোনও অন্যায় করিনি। তবু কেন এই ফলভোগ।

মনে যখন চূড়ান্ত হতাশা তখন আটাশ-উনত্রিশ বছর বয়সী যুবক নগেন্দ্র-র কাছে খাতা-পেন-ই হয়ে উঠল একান্ত আপনার জন। নিজস্ব রচনার মধ্যেই সে খুঁজে নিল মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। সেই সাথে মধ্যপ্রদেশের রেওয়া সেন্ট্রাল জেলের মধ্যেই সে খুঁজে পেল এক অন্যরকম 'জেলার'কে। যাঁর হৃদয়ের যাবতীয় কোমল স্থান যেন কঠোর আবরণে আচ্ছাদিত। জেলারের নাম সুরেন্দ্র সিং। যিনি বুঝেছিলেন ছেলেটা নির্দোষ। তার থেকেও বড় কথা ওর মধ্যে একটা সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে, যার বিকাশ করা একান্তভাবেই জরুরী।

জেলার সুরেন্দ্র সিং-এর অনুভবটা যে আজ থেকে বছর আষ্টেক আগে একেবারেই ভুল ছিল না তার প্রমাণ মিলল মাস-খানেক আগে। জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে নগেন্দ্র সিং পরিহার। তাঁকে মুক্তি দিয়ে জবলপুর উচ্চ-আদালত বলেছে, নগেন্দ্র তাঁর স্ত্রী-কে

নগেন্দ্র পরিহার (মাঝখানে)

মোটেই হত্যা করেনি। নগেন্দ্র-র স্ত্রী আসলে আত্মঘাতী হয়েছেন। বিচারের বাণী অনেক সময়েই যে এদেশে নীরবে নিভৃতে কাঁদে— তাতে আর আশ্চর্য হবার কি রয়েছে?

কিন্তু আশ্চর্য হতেই হচ্ছে? ওই যে আপন রচনার মধ্যে মনের শান্তি; প্রাণের আরামের কথা উল্লেখ করেছিলাম; তাই করেই সাতটি উপন্যাস আর শ'খানেকেরও বেশি কবিতা এবং কয়েকডজন ছোট গল্প ও নাটকও লিখে ফেলেছেন নগেন্দ্র। ন-দশটা বছর জেলে কাটানোর ফাঁকে হিন্দি, ইংরেজি এবং সোসিওলজিতে এম এ পাশও করে ফেলেছেন রেওয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। প্রজ্ঞা সঙ্গীত সমিতি থেকে সঙ্গীতে দু'বছরের ডিপ্লোমা করেছেন, কম্পিউটারেও পাস করেছেন ডিপ্লোমা। জেলার সুরেন্দ্র ঠিকই অনুমান করেছিলেন। সামান্য একজন খুনীর এমন অধ্যবসায় সম্ভব নয়। কিন্তু এমন একজন গুণী মানুষের কি খুন করা সম্ভব? খুন করা যে সম্ভব নয় তা আজ প্রমাণিত। কিন্তু মিথ্যে অপবাদে দিনের পর দিন কারান্তরালে থাকা গুণীমানুষের গুণ তো নষ্ট হয়ই। কিন্তু নগেন্দ্র-র ক্ষেত্রে তা হয়নি। তাই তিনি অন্যরকম।

নগেন্দ্র'র লেখা প্রথম কবিতাটি হলো —'গুমনাম নঁহী মরুঙ্গা ম্যায়'। এই হিন্দী উদ্ধৃতিটির বাংলা মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়— 'বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গিয়ে আমি মরব না।' নগেন্দ্র এর ব্যাখ্যা করেছেন— 'আমার লেখা শব্দগুচ্ছের ক্ষমতার ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। তারা আমার দেহটাকে জেলে বন্দী করতে পারে কিন্তু আমার আত্মাকে নয়।'

চট্টগ্রাম বন্দর ও ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ

সুবীর ভৌমিক

সুসংবাদ, পূর্বোত্তরের জন্য এবং অবশ্যই ত্রিপুরাবাসীর জন্য।

যদিও চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহারের জন্য এখনও বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি মেলেনি। অর্থাৎ বাংলাদেশ এখনও পূর্বোত্তর বিশেষ করে ত্রিপুরার ব্যবহারের জন্য বাংলাদেশের সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রামকে উন্মুক্ত করে দেয়নি। তবে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এটাই ত্রিপুরা তথা পূর্বোত্তরের কাছে খুশির খবর। বিবিসি-র সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান কমাণ্ডার রিজাউদ্দিন আহমেদ বলেন, যদি পূর্বোত্তর সহ নেপাল, ভূটান, চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহারের অনুমতি পায় তাহলে একদিকে যেমন চট্টগ্রাম বন্দরের আয়ের সুযোগ বাড়বে তেমনি গোটা চট্টগ্রামের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। কমঃ আহমেদ বলেন, আমরা আশা করছি চট্টগ্রাম বন্দরকে দিয়ে আমরা দারুণ ব্যবসা করব এবং এই ব্যবসা অবশ্যই লাভজনকও হবে।

যদি শেষমেশ চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি মেলে পূর্বোত্তর তথা নেপাল, ভূটানের কাছে এবং এই বন্দর নিয়মিত ব্যবহৃত হয়, তাহলে গোটা চট্টগ্রাম-এর অর্থনীতির চেহারা পাল্টে যাবে। তিনি আরও বলেন, বার্মা যদি চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে রাস্তা চট্টগ্রাম পর্যন্ত ব্যবহারের অনুমতি দেয় তাহলে চীনকেও এই বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেবে বাংলাদেশ। তবে এই ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে শুধুমাত্র বাণিজ্যিক কারণে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই দেশের স্বাধীনতা নিয়ে দেশ গর্বিত। কিন্তু আমরা কোনও অপর দেশকে উপকূল এলাকায় সেনা ছাউনি বাড়ানোর অনুমতি কখনোই দেব না। আমরা চট্টগ্রাম বন্দরকে কোনও বিদেশী রাষ্ট্রকে নৌ-ঘাঁটি বানানোরও অনুমতি দেব না। এটা আমেরিকা হোক কিংবা চীন বা ভারত। আমরা শুধু চট্টগ্রাম বন্দরকে একটি বাণিজ্যিক ও ব্যবসা কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চাই। এবং আমাদের আশা এটা আমরা গড়ে তুলবই। চট্টগ্রাম-এর মেয়র এবং প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরী প্রায় একই সুরে বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরকে সবদিক দিয়ে ব্যবসা ও বাণিজ্যের উপযুক্ত একটি আধুনিক কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হবে। তবে একে কোনও বিদেশী রাষ্ট্রের বন্দর হিসাবে কাজ করতে দিতে বাংলাদেশের আপত্তি রয়েছে। প্রসঙ্গত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চট্টগ্রাম বন্দরে একটি নৌ ঘাঁটি গড়ে তুলতে দীর্ঘদিন ধরেই উদ্যোগী। ১৯৯১ সালে ত্রাণ সংক্রান্ত একটি টাস্ক ফোর্স পাঠিয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায়। সেই থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রতি নজর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।

এদিকে, কমঃ আহমেদ আরও জানান, চট্টগ্রাম বন্দরই শুধু নয়, চট্টগ্রাম-এর আশপাশের নানা বন্দরকে নিয়ে একটি চেইন অব পোর্ট গড়তে চায় বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম বন্দরের উপর যাতে বেশি চাপ না পড়ে সেজন্যই এই উদ্যোগ।

তিনি জানান, কক্সবাজারের উপকূলে সোনাজিয়ায় একটি গভীর সমুদ্র বন্দর আমরা গড়তে চাই। তেমনি রাঘনা বাঁধ এবং

আন্দরমানিক নদীর উপরেও একটি তৃতীয় বন্দর-কালাপাড়া আমরা গড়তে চাই। এই দুটি নদী সমুদ্রে এসে যেহেতু মিলিত হয়েছে কাজেই পথগুলি খুবই সহজ হবে এক্ষেত্রে। তিনি আরও জানান, একটি পোর্ট সিস্টেম প্রয়োজন বাংলাদেশের। চট্টগ্রাম-এর উপর থেকে চাপ কমাতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ জরুরী। ঠিক যেমন কলকাতা বন্দরের উপর চাপ কমাতে হলদিয়াকে গড়ে তোলা হয়েছিল। তেমনি হলদিয়ার পাশাপাশি কুলপি ও সাগরেও বন্দর তৈরি করা হয়। কাজেই সমস্ত বড় বড় বন্দরের একটি পোর্ট সিস্টেম থাকা প্রয়োজন। একটি বড় বন্দরকে ঘিরে ছোট ছোট বন্দর গড়ে ওঠা দরকার।

ভবিষ্যতের লক্ষ্য কি?

কমঃ আহমেদ জানান, চট্টগ্রাম শুধু বাংলাদেশেরই প্রধান বন্দর হবে না, পূর্বোত্তর ভারতেরও অত্যতম প্রধান হিসাবে ব্যবহৃত হবে চট্টগ্রাম। এছাড়া নেপাল, ভূটান, দক্ষিণ-পশ্চিম চীনও চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার করে ওই সমস্ত দেশগুলি যেমন একদিকে উপকৃত হবে তেমনি চট্টগ্রাম-এর আর্থিক চেহারারও উন্নতি ঘটবে। তবে চীনের ইউনান প্রদেশ থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তার আগে ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এজন্য বার্মার সহযোগিতা প্রয়োজন। বার্মা রাজি না হলে তা সম্ভব নয়। তবে এই মুহূর্তে ভারত ও চীন উভয়েই চাইছে সিতওয়ে (আকইয়াব) বন্দর যা আরাকানে অবস্থিত, এর উন্নতিসাধন ঘটানো। এটি পুরানো বন্দর। এটি চট্টগ্রাম থেকেও পুরানো বন্দর। তবে এর পরিকাঠামো বলতে কিছুই নেই। ভারত সেজন্য এই বন্দরে ব্যাপক বিনিয়োগ করার উদ্যোগ নিয়েছে।

কালাদান মাল্টি নোডাল সি রিভার প্রজেক্টের মাধ্যমেই এই বন্দরকে ভারতের সমুদ্র বন্দর ব্যবহারের উপযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে চায় ভারত। এতে করে বার্মার মাধ্যমে ভারতের পূর্বোত্তরের রাজ্যগুলিও উপকৃত হবে। তবে এই প্রজেক্টে'র অগ্রগতির গতি অত্যন্ত শ্লথ। এর কারণ চট্টগ্রাম বন্দর যদি ভারতের ব্যবহারের জন্য উপযোগী হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে সিতওয়ে বন্দরটি ভারতের তেমন কাজে আসবে না। ভারত আগেই কালাদান প্রকল্পের বিষয়ে ইতিবাচক। কারণ এর আগে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন বি এন পি-জামাত জোট সরকার চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারতের ব্যবহারের পক্ষে ছিল না, সেজন্য ভারত দ্বিতীয় পছন্দ হিসাবে এটিকে হাতে রেখেছিল। বর্তমানে অবশ্য বাংলাদেশে শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় রয়েছে। সেজন্যই চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারত ব্যবহারের বিষয়ে খুবই আশাবাদী এবং এ সংক্রান্ত কাজকর্ম শীঘ্রই শুরু হবে বলে ভারতের আশা। অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরকে ভারত ব্যবহার করলে পূর্বোত্তরের অন্যতম হাব যেমন হয়ে উঠবে ত্রিপুরা, তেমনি সিতওয়ে বন্দরকে যদি ভারত ব্যবহারের সুযোগ পায় তাহলে পূর্বোত্তরের অপর রাজ্য মিজোরাম হয়ে উঠবে হাব। সেই ক্ষেত্রে অসম পূর্বোত্তরের অন্যতম প্রধান ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে অনেকটাই গুরুত্ব হারাবে। সেই দিক থেকে চট্টগ্রাম বন্দরের সঙ্গে ত্রিপুরার ভাগ্যও জড়িয়ে রয়েছে।

(দৈনিক সংবাদ-এর সৌজন্যে)

অসমে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে শিকারীদের মদত দিচ্ছে বাংলাদেশ

সংবাদদাতা ॥ অসমের ওরাং ন্যাশনাল পার্ক-সংরক্ষিত বনাঞ্চলে এবার চোরাশিকারী ও সশস্ত্র জবরদখলকারীদের হাতে দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল পশুপ্রেমী ও বনরক্ষী সরকারি ফরেস্ট গার্ডের। তার নাম—আব্দুল হাসান আলি (৫০)। গত ১১ জুন রাত দশটা নাগাদ গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল পরপর কয়েকবার। ও এন পি-এর জঙ্গলে চোরাশিকার প্রতিরোধে স্থাপিত ১নং ক্যাম্পের কাছেই গুলির শব্দ শোনা গিয়েছিল। পরে অন্য কর্মীরা খোঁজাখুঁজি শুরু করে। রাত দুটো নাগাদ পিছমোড়া করে হাত বাঁধা ও শোয়ানো অবস্থায় আলির মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহের কাছেই আলির ওয়ারলেশ সেট ও .৩১৫ রাইফেল গুলিভরা অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্রসঙ্গত, পৃথিবীর মধ্যে বিরল প্রজাতির এক শৃঙ্গবিশিষ্ট গণ্ডার এই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে রয়েছে। বহুমূল্য এই শৃঙ্গের লোভে চোরাশিকারীরা সর্বদাই সচেষ্ট।

১৯৮৫ সালে চাকরিতে ঢোকার পর থেকেই সাহসী আব্দুল যেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন চোরাশিকার রোধ করার। ফলে তিনি চোরাশিকারী ও পার্কে জবরদখলকারী এবং অসাধু সহকর্মীদের টার্গেট হয়ে পড়েন। মাস দুয়েক আগে পার্কের ঝিলে বেআইনীভাবে মৎস্যশিকার করতে গিয়েছিলেন দুই এম এল এ। তারাও জোরজুলুম করে সুবিধা করে উঠতে পারেনি।

গত মাসের ১৭ তারিখে সশস্ত্র শ'চারেক বাংলাদেশী দুর্বৃত্তের সঙ্গে পুলিশ ও বনরক্ষীদের ভয়ানক সঙঘর্ষ হয়। ওই বাংলাদেশীরা (পড়ুন মুসলমান) ওরাং সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দক্ষিণ অংশের হাজার -বিঘার ফাঁকা জমিতে কমপক্ষে কুড়িটির বেশী ঝুপড়ি বানিয়ে ফেলেছিল। দুপক্ষে, তুমুল সংঘর্ষ বাধে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত চারজন বাংলাদেশী দুর্বৃত্ত মারা গিয়েছে। তাদের দুই পাণ্ডা পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। নাম—আবদুল রহমান বিশ্বাস এবং জাকির হুসেন রববানি। এরা দুজনেই মঙ্গলদৈ-এর দু নম্বর ওয়ার্ডে থাকত।

গত বছর নভেম্বর মাসেই আব্দুল হাসান আলি বুঝে গিয়েছিল তার প্রাণসংশয়। সেজন্য সে নিকটবর্তী শিলবাড়ি পুলিশ ফাঁড়িতে এফ আই আর-এ জানিয়েছিল তাকে প্রাণে মারার হুমকী দিয়েছে একশ্রেণীর লোকেরা। হাসান আলির সাহসী ভূমিকা চোরাশিকারীদের পছন্দ হয়নি। কিন্তু পুলিশ তার জীবন রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেনি। এই হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ পার্কের মাহুত তাজউদ্দিন আহমেদ, তার বাবা নাসিরুদ্দিন আহমেদ এবং ভাই বিয়াজুদ্দিন আহমেদকে গ্রেপ্তার করেছে। গ্রেপ্তার হয়েছে নিহত আব্দুল হাসান আলিরই সহকর্মী হোমগার্ড জওয়ান ইরসাদ আলি।

রাজ্যের বনবিভাগ কর্তৃপক্ষ নিহতের পরিবারকে একুশ হাজার টাকা দিয়েছে এবং তার দুই ছেলেকে পার্কেই স্থায়ী চাকরি দেবার আশ্বাস দিয়েছে।

এই ঘটনা বাংলাদেশী মুসলিম ও তাদের এদেশীয় সাহায্যকারীদের মুখোশটা সবার সামনে খুলে দিয়েছে। বাংলাদেশী মুসলমানদের মতলব এই ঘটনায় আরও একবার প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

মালদায় জনগণের ক্ষোভ

জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা সত্ত্বেও সিপিএম বিধায়ককে গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ

সংবাদদাতা ঃ মালদা ॥ ভারতীয় সংবিধানে দেশের সকল নাগরিককে আইনের চোখে সমান বলা হলেও পশ্চিমবঙ্গে যারা আইন প্রণয়ন করেন তারাই যে আইন-কে লঙঘন করে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন মালদা জেলার সিপিএম বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ তার প্রত্যক্ষ উদাহরণ। মালদা জেলার কালিয়াচকের সিপিএম বিধায়ক বিশ্বনাথ ঘোষ গত বছর ৭ জুন খালতিপুর স্টেশনে কয়েক হাজার লোক নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলন করেন এবং রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর করেন। স্টেশন কর্তৃপক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে রেল পুলিশ বিধায়কের বিরুদ্ধে এফ, আই, আর করেন। কিন্তু ঘটনার এক বছর পরেও রেল পুলিশ বিধায়ককে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। সম্প্রতি রেল পুলিশের রিপোর্টের ভিত্তিতে আদালত বিধায়কের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে। কিন্তু সিপিএম বিধায়ক আত্মসমর্পণ করবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। জেলার রাজনীতিতে এই নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়েছে। এদিকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পর ওই সিপিএম বিধায়ক ১২ জুন কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জে একটি মাদ্রাসার ক্লাসঘর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। সেখানে ছিলেন মাদ্রাসা শিক্ষামন্ত্রী আবদুস সাত্তারও। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও এদিন ওই বিধায়ক দিব্যি অনুষ্ঠান মঞ্চে বসে থাকায় অনেকেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তারা বলছেন, এই ঘটনা থেকে বোঝা যায় সিপিএমে নীতি, নৈতিকতা ও আদর্শ বলে কিছু নেই। তাছাড়া এই ঘটনায় রাজ্যের মন্ত্রী, পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তাদের ভূমিকা নিয়েও সাধারণ মানুষ প্রশ্ন তুলেছে। তারা বলে, এলাকায় ছোটখাটো গোলমাল হলেই পুলিশ যাকে পারে তাকেই গ্রেপ্তার করে। নিরীহ গ্রামবাসীদের কথায় কথায় পুলিশ হেনস্থা করে অথচ গ্রেপ্তারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও পুলিশ বিধায়ককে গ্রেপ্তার করছে না। কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি নেতৃত্ব এই ঘটনার নিন্দা করেছেন। বিধায়কের উত্তর, সাহস থাকলে পুলিশ গ্রেপ্তার করে দেখাক। এই নেতাকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে জেলা ও রেল পুলিশের মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছে। রেলের সম্পত্তি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ সহ একগুচ্ছ অভিযোগ ও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা যে এখন রাজনীতির অঙ্গ — একথা পুলিশ প্রশাসন এতদিনের বামফ্রন্টের রাজত্বে খুব ভাল ভাবেই বুঝে গেছে।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা এবং ফোন নাম্বার (যদি থাকে) থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না। — স্বঃ সঃ

গভীর পরিবেশ-সঙ্কটের মুখে পাঞ্জাব

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভয়াবহ পরিবেশ-সঙ্কটের মধ্যে পড়তে চলেছে পাঞ্জাব। গত বছরেই সেখানকার মালওয়া জেলায় শিশুদের মধ্যে চুলের নমুনায় অত্যধিক পরিমাণে ইউরেনিয়াম আবিষ্কারের পর রাজ্যের পরিবেশ-বিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। গত একবছর ধরে এ নিয়ে গবেষণা

করে তাঁরা দেখেন—পাঞ্জাবের পরিবেশের দ্রুত অবনতি ঘটছে। বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত পদার্থে ভরে যাচ্ছে পাঞ্জাবের আকাশ, বাতাস, মাটি। 'পরিবেশ-বিজ্ঞানে'র ভাষায় বিজ্ঞানীরা বলছেন 'টক্সিসিটি হটস্পট'-এ পরিণত হচ্ছে পাঞ্জাব।

গতবছর একটি খুব উন্নতমানের জার্মান ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষার পর জানা যায়, মূলত পাঞ্জাবের মালওয়া জেলার ১৪৯ জন স্নায়বিক দৌর্বল্যজনিত শিশুর ৮০ শতাংশের চুলের নমুনা সংগ্রহ করার পর দেখা যায় তাতে খুব বেশি পরিমাণে ইউরেনিয়াম তো আছেই, সেইসঙ্গে টক্সিসিটির তিনটি প্রধান শ্রেণী—রাসায়নিক, তেজস্ক্রিয় এবং জৈবিক বিদ্যমান। টক্সিসিটি বলতে পরিবেশ-বিজ্ঞানের পরিভাষায় কোনও বস্তুতে বিষক্রিয়ার পরিমাণ বোঝানো হয়।

এই তথ্য যে খুব একটা মিথ্যে নয় তার প্রমাণ গাছপালা পশু-পাখী, এমনকী মানুষের মধ্যেও এই বিষক্রিয়া লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ইংল্যাণ্ডের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়, এক্সিটের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডঃ রেইজ তিরাডো মনে করছেন— 'এটা এখন আমাদের কাছে পরিষ্কার হওয়া উচিত যে পাঞ্জাববাসী গভীর পরিবেশ সঙ্কটের মধ্যে গিয়ে পড়েছে, সামাজিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে।' ডঃ রেইজ গতবছর গ্রীনপীস রিসার্চ ল্যাবরেটরিস ইনভেস্টিগেশনের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের মুক্তসার, ভাতিন্ডা এবং লুধিয়ানা জেলার প্রায় পঞ্চাশটি গ্রামে ঘুরে সমীক্ষা চালান। এতেই তাঁর ওই উপলব্ধি।

ওই সমীক্ষায় আরও একটি মারাত্মক জিনিস পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায় সিন্থেটিক নাইট্রোজেন সারের মাত্রা কৃষি-প্রবণ এলাকায়

ভূ-গর্ভস্থ জলকে বিষিয়ে তুলেছে। ফলে কৃষিকাজের অসম্ভব ক্ষতি হচ্ছে। যে সমস্ত নলকূপ এবং টিউবওয়েল রয়েছে ওইসব এলাকায় তার জল পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা নির্ধারিত নাইট্রেট মাত্রা (প্রতি লিটার জলে ৫০ মিগ্রা)-র অনেকগুণ বেশি পরিমাণ নাইট্রেট লবণ রয়েছে।

রেইজের মতে, "নাইট্রেট দূষণ সরাসরি অত্যধিক সিন্থেটিক নাইট্রোজেন কীটনাশক ব্যবহারের সঙ্গে যুক্ত। যত বেশি নাইট্রোজেন জাতীয় যৌগ (যেমন ইউরিয়া) পড়বে চাষের মাটিতে, তত বেশি নাইট্রেট দূষণ দেখা যাবে কাছাকাছি টিউবওয়েলের জলে।" এই নাইট্রেট দূষণ সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ছে গিদ্দারবাহ জেলার ডোডা গ্রামে। সম্ভবত এই অত্যধিক নাইট্রেট দূষণের কারণেই গিদ্দারবাহ-তে প্রচুর ক্যান্সার রোগী ধরা পড়েছে। পাঞ্জাবের অর্থমন্ত্রী মনপ্রীত বাদলের নিজের গ্রাম ডোডা। তাঁর নিজের রাজ্য তো বটেই, নিজের গ্রামেও যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে মনপ্রীত বাদলের উচিত সর্বাগ্রে তার মোকাবিলা করা, তারপর অন্যকাজে মন দেওয়া। এমনটাই মনে করছেন পাঞ্জাববাসী।

সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার ভারতের জন্য উপযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন ও ব্যবহার ভারতের পক্ষে লাভদায়ক এবং উপযোগী। সম্প্রতি এই মন্তব্য করেছেন 'মিলেনিয়াম টেকনোলজি' পুরস্কার বিজেতা হেলসিঙ্কির জার্মান বৈজ্ঞানিক মিখাইল গ্রাজেল। তিনি আরও বলেছেন, সৌরবিদ্যুৎ ভারতের পক্ষে আর্থিকভাবেও সাশ্রয়কারী। গ্রাজেল যে পুরস্কার পেয়েছেন ইউরোপে তা নোবেল পুরস্কারের সমান বলে ধরা হয়। অধ্যাপক গ্রাজেল আরও বলেছেন, "আমি ভারতবর্ষের বিষয়ে উৎসাহী। সৌর-বিদ্যুৎ সস্তা এবং তার উৎসও অফুরন্ত। এছাড়া এই বিদ্যুতের বিশেষত্ব হলো, নন-টক্সিক বা বিষবর্জিত।" প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোকাকোলা-র ঠাণ্ডা নরম পানীয়ে বেশ কিছু পরিমাণ টক্সিসাইড মেশানো থাকে বলে তা পান করা ক্ষতিকারক। যা নিয়ে বারবার চর্চা হয়েছে। অধ্যাপক গ্রাজেল একধরনের 'সোলার সেল' উন্নত করেছেন। এই প্রক্রিয়াটা গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয়। গাছের পাতা যেমন সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রসদ সংগ্রহ করে ঠিক তেমনই। তাঁর মতে রেফ্রিজারেশন-এর ক্ষেত্রে সৌর বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী এবং উপযোগী।

গত এপ্রিল মাসে গ্রাজেল দক্ষিণ ভারতের কোয়েম্বাটুরে এসেছিলেন। তিনি ভারতের প্রখর সূর্যতাপ দেখে প্রচণ্ড উৎসাহিত। তাঁর মতে ভারতে পেট্রল-ডিজেলের দাম অনেক বেশি। সেক্ষেত্রে সোলার এনার্জিই বিকল্প হিসাবে গ্রহণযোগ্য ব্যবস্থা। সোলার সেলের উন্নত সংস্করণ তৈরির জন্যই মিখাইল গ্রাজেল পুরস্কার জিতে নিয়েছেন। প্রতি দু'বছর অন্তর ওই পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কারের অর্থমূল্য দশলক্ষ আমেরিকান ডলার।

গ্রাজেল জানিয়েছেন, সোলার বিদ্যুৎ পানীয় জল পরিশ্রুতকরণ, মোবাইলের ব্যাটারি চার্জ করতেও সোলার এনার্জি ব্যবহার করা যাবে। জাপানে রাস্তার আলো সৌরবিদ্যুৎ থেকেই জ্বালানো হয়। সেজন্য সোলার বিদ্যুতের ব্যবহারের বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। সর্বোপরি, সৌরবিদ্যুৎ দূষণমুক্ত, সস্তা এবং কার্যকরী—এমনই মন্তব্য বিজ্ঞানী মিখাইল গ্রাজেল-এর।

স্বস্তিকার দাম
প্রতি সংখ্যা - ৪.০০ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য
সডাক্ - ২০০.০০ টাকা

একবছরে অনাহারে মৃত্যু ৩৩

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কংগ্রেসী শাসনের বছর দেড়েকের মধ্যেই হতশ্রী অবস্থা রাজস্থানের। রাজ্যের উদয়পুর জেলার জনজাতি অধ্যুষিত কোটাডা ব্লকের ঝের গ্রামে গত এক বছরে স্রেফ অনাহারে তেত্রিশ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ-সংস্থা সূত্রে খবর। মাসের হিসেবে দাঁড়াচ্ছে, প্রতি মাসে গড়ে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে গত একবছরে। যদিও অশোক গেহলট সরকার এই পরিসংখ্যানকে একেবারেই পাত্তা দিতে চাইছে না। তারা বরং পুরো ব্যাপারটাকেই অস্বীকার করছে। এমনকী স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট গোটা তথ্যটাকেই মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। উদয়পুরের জেলাশাসক আনন্দ কুমার তার জেলায় মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত ওই তথ্য-পরিসংখ্যানকে সেভাবে মানতে না চাইলেও অনাহারে অন্তত একজনের মৃত্যুর খবর

স্বীকার করে নিয়েছেন। অবশ্য বাকি বত্রিশ জনের মৃত্যুর ঘটনাকে তিনি অস্বীকার করছেন না, তবে অনাহার-ই যে ওদের মৃত্যুর কারণ তাও বলছেন না। সংবাদমাধ্যমের প্রবল চাপের মুখে তিনি জানিয়েছেন, বাকিদের মৃত্যুর কারণও খতিয়ে দেখা হবে।

সাংসদ কিরোরী লাল মীনা অনাহারে মৃত্যু নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন সংসদে। তিনি দৌসা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত নির্দল সদস্য। যদিও পূর্বে মীনা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু সংরক্ষণ আন্দোলনের সময় তিনি দলীয় সদস্যপদ ত্যাগ করেন। রাজ্য প্রশাসনের নোটিশ দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে গত ১২ জুলাই তিনি উদয়পুর জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে ধর্নায় বসেন। বেগতিক বুঝে ওইদিন রাতেই জেলা প্রশাসনের কর্তারা গ্রামে ত্রাণসামগ্রী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে ধর্না প্রত্যাহার করে নেন মীনা। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন—"যখন আমার কানে এতগুলো মৃত্যুর ঘটনা এসে পৌঁছায়, আমি নিজে তখন সেই গ্রামে যাই। যাতে 'ফার্স্ট-হ্যান্ড' অভিজ্ঞতা লাভ করা সম্ভব হয়। আমার কাছে মৃত ব্যক্তিদের নাম-ধাম সবকিছু রয়েছে।" প্রসঙ্গত, ঝের গ্রামটি কোটাডা ব্লকের মুখ্য-কার্যালয় থেকে খুব

একটা দূরে নয়। মীনার অভিযোগ "অনাহারে মৃত্যুর খবর ব্লক প্রশাসনের কাছে থাকলেও গত এক বছরে একবারও গ্রামটি ঘুরে দেখার কোনও গরজ দেখায়নি তারা।" গোপন সূত্রের খবর, জেলা শাসক সরকারের কাছে পাঠানোর জন্য যে গোপন রিপোর্টটি তৈরি করেছেন তাতে বলা হয়েছে—সম্ভবত অপুষ্টির কারণেই ওই গ্রামবাসীদের মৃত্যু হয়েছে এবং গ্রামে ফসল উৎপাদন না হওয়ার জন্য গত এক বছরে সংঘটিত প্রতিটি মৃত্যুর জন্যই অনাহার-কে দায়ী করা যেতে পারে।

জেলা-শাসককে দেওয়া স্মারকলিপিতে মীনা বলেছেন, অধিকাংশ গ্রামবাসীকেই না দেওয়া হয়েছে রেশন কার্ড, না তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বিপিএল তালিকায়। যদিও ঝের গ্রামের সিংহভাগ বাসিন্দারই হত-দরিদ্র অবস্থা।

রাজস্থানের পাশের রাজ্য গুজরাট। জন-বন্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে সেখানে গম এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের সুষ্ঠু সম্ভব হয়েছে। কিন্তু প্রতিবেশী রাজ্য রাজস্থানে গণবন্টন ব্যবস্থা থাকলেও খাদ্যদ্রব্যের সুষ্ঠু বিতরণ সেখানে সম্ভব হয়নি। কারণ অশোক গেহলট মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আসার পর সেখানকার প্রশাসন আপাদমস্তক দুর্নীতিতে ঢেকে গিয়েছে। এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

কিরোরী লাল মীনার স্ত্রী গোলমা দেবী অশোক গেহলট মন্ত্রিসভার একজন সদস্য। কিন্তু সরকারে অপদার্থতা নিয়ে নিজের স্ত্রী-কেও ছাড়েননি মীনা। স্ত্রী-কে পাঠানো একটি চিঠিতে মীনা জানতে চেয়েছেন, কেন তিনি পদত্যাগ করবেন না গেহলট সরকার থেকে? কারণ এই সরকার ক্ষমতায় আসা ইস্তক রাজ্যের গরীবদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

সরকারি দায়িত্বে ইসলামের সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৭৬ সালে ভারতের সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। উদ্দেশ্য, দেশের মুসলমান নাগরিকবৃন্দ যাতে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রচার করতে পারেন। কোনও বাধা সৃষ্টি যাতে না হয়। ভারতকে ইস্‌লামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ফরজানা বেগম ওরফে ইন্দিরা গান্ধী কাশ্মীরে নির্বাচনের পূর্বে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা আমরাই প্রবর্তন করেছি, আমরা তা তুলে দিতে পারি না।

ভারতকে ইস্‌লামিক রাষ্ট্রে পরিণত করার কাজকর্ম পরিকল্পনা মতোই জোর কদমে এগোচ্ছে। অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। স্বাধীনতার আগে দেশভাগ করে পাকিস্তান গঠনের সম্ভাবনা দেখা দিলে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী পরবর্তীকালে যিনি জাতির জনক হিসেবে পুজিত হতে থাকলেন তিনি মুসলিম লীগ নেতা মহঃ আলি জিন্নাহ্‌কে অনুরোধ করেছিলেন ভারত ভাগ না করে তিনিই ভারতের প্রধানমন্ত্রী হোন এবং নিজের পছন্দমতো লোক নিয়ে মন্ত্রীসভা গঠন করুন। কিন্তু মহঃ আলি জিন্নাহ্‌ গান্ধীজীর এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কারণ তিনি একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হতে চেয়েছিলেন। অবশ্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দাবীদার আরও একজন ছিলেন। তিনি গান্ধীজীর প্রধান 'চ্যালা' পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যিনি নিজেকে বলতেন শিক্ষায় ইংরেজ, সংস্কৃতিতে মুসলমান এবং দৈবদুর্ঘটনা-বশতঃ জন্মে হিন্দু। স্বভাবত হিন্দুধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ থাকার কথা নয় এবং তা ছিলও না। তিনিই হয়েছিলেন স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়েই তিনি নজর দিলেন। মুসলমানদের সুবিধে অসুবিধের দিকে। তিনি মুসলিম প্রধান কাশ্মীর নিয়ে এমন এক জটিলতা সৃষ্টি করলেন যাতে এখনও, স্বাধীনতার ৬২ বছর পরেও কাশ্মীর ভারতের 'head and headache' হয়ে রয়েছে এবং থাকবেই। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে ডঃ বি আর আম্বেদকর, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং আরও অনেকে চেয়েছিলেন ধর্মের ভিত্তিতে যখন দেশভাগ হয়েছে তখন ধর্মের ভিত্তিতে লোক বিনিময় হোক। অর্থাৎ ভারতের মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে যাবেন এবং পাকিস্তানের হিন্দুরা ভারতে চলে আসবেন। অতি যুক্তিসঙ্গত। পাকিস্তানের জনক মহঃ আলি জিন্নাহ্‌ও চেয়েছিলেন লোক বিনিময়। কারণ তার আশঙ্কা ছিল ১৯৪৬ সালে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশান'-এর নামে হিন্দুদের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে হিন্দুরা তার বদলা নিতে পারে। কিন্তু বিরোধিতা করেছিলেন স্বয়ং গান্ধীজী। তিনি বলেছিলেন লোক বিনিময়ের কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না। ভারতে মুসলমানরা যিনি যেখানে যেমন আছেন তেমনই থাকবেন। অর্থাৎ ভারতের ইসলামিকরণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপিত হলো। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শেখ আবদুল্লাকে, একজন জাতীয়তা-বিরোধী কাশ্মীরী মুসলমানকে কাশ্মীরের প্রধান নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োগ করে কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা চালু করে কাশ্মীরকে বিশেষ অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ফলে কাশ্মীর একটি স্বশাসিত প্রায় ইস্‌লামিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরগুলির গুরুত্বপূর্ণ পদগুলিতে ভারত বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নানা কৌশলে খতম্‌ করার খেলায় মাতলেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কন্যা এক মদ বিক্রেতার ছেলে ফিরোজ খানকে শাদী করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে হয়েছিলেন ফরজানা বেগম। এই ফরজানা বেগম তথা ইন্দিরা গান্ধীর অবদানও এতে কিছু কম ছিল না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনিও শেখ আবদুল্লাকে কাশ্মীরের প্রধান হিসেবে রেখে তাকে আবার ভারত বিরোধী কাজকর্ম করার সুযোগ করে দিলেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ১২ হাজারেরও বেশী পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলি ভুট্টোর সঙ্গে যিনি ভারতের সঙ্গে হাজার বছর যুদ্ধ করার হুংকার দিয়েছিলেন।

১৯৭৬ সালে ভারতের সংবিধান সংশোধন করে ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ঘোষণা করা হলো। উদ্দেশ্য, দেশের মুসলমান নাগরিকবৃন্দ যাতে স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ এবং ধর্মপ্রচার করতে পারেন। কোনও বাধা সৃষ্টি যাতে না হয়। ভারতকে ইস্‌লামিক রাষ্ট্রে পরিণত করতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। ফরজানা বেগম ওরফে ইন্দিরা গান্ধী কাশ্মীরে নির্বাচনের পূর্বে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন, কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা আমরাই প্রবর্তন করেছি, আমরা তা তুলে দিতে পারি না। কাশ্মীরীদের মুসলিম চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কিছু নাগরিককে ঐস্লামিক চরিত্র বজায় রাখার সুড়সুড়ি দিলেন। তিনি দেশের ৪১টি জেলাকে ১৯৭১-এর সেনসাস্‌ অনুযায়ী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা হিসেবে চিহ্নিত করলেন এবং সেই সমস্ত জেলায় সংখ্যালঘুরা অর্থাৎ মুসলমানরা যাতে অর্থনৈতিক ভাবে বিশেষ সুবিধে পান তার জন্য ১৫ দফার এক বিশেষ কর্মসূচীর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ২০ বছর পর অর্থাৎ ২০১১-র জনগণণায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার সংখ্যা দাঁড়াবে ৪৫০-এর কাছাকাছি। তখন এদের জন্য ১৫ নয় ২০ দফা বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর তার পুত্র রাজীব রবার্তো গান্ধীও মাতা এবং মাতামহের প্রদর্শিত পথেই পদচারণা শুরু করলেন। অর্থাৎ মুসলিম তাস খেলতে শুরু করলেন। শাহবানু মামলার কথা ইতিমধ্যে বিস্মৃত হইনি নিশ্চয়ই। বিগত যৌবনা, তালাক প্রাপ্তা শাহাবানুকে খোরপোষ দেওয়ার স্বপক্ষে সুপ্রীম কোর্ট রায় দিয়েছিল। বিষয়টা ১৯৮৫ সালের। দেশের আইন অনুযায়ী সুপ্রীম কোর্টের এই নির্দেশ ছিল যথাযথ। কিন্তু হই হই পড়ে গিয়েছিল মুসলিম সমাজে। মুসলমানরা তাদের "ব্যক্তিগত আইনের" রক্ষাকবচে কোনও বিচারালয়ের রায় মানতে বাধ্য নয়। তাই তৎকালীন রাজীব রবার্তো গান্ধী সরকার দেশের সংবিধান সংশোধন করে দেশের প্রচলিত আইনের পরিবর্তন ঘটালেন। দেশের কিছু ধর্মান্ধ মোল্লাদের সন্তুষ্ট করতে গিয়ে মুসলমানদের তালাকপ্রাপ্তা শাহাবানুসহ অন্যান্য মহিলাদের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ করা হলো। তা হোক, কিন্তু কিছু উগ্র ধর্মান্ধ মওলানা, মওলভীকে তো ঠাণ্ডা করা গেল। সেই সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে ইসলামি-করণের দিকে এক ধাপ এগিয়ে নেওয়া গেল। মন্দ কি?

ভারতের সংবিধান প্রযুক্ত হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারী। পৃথিবীর যে কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংবিধান রচিত হয় দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করেই। সেক্ষেত্রে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করা উচিৎ ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি। ভারতের সংবিধান রচিত হয়েছিল ভারতের সমস্ত শ্রেণীর নাগরিকদের স্বার্থ রক্ষা করেই। তবুও পরবর্তীকালে বহুবার সংবিধান সংশোধন করা হয়েছে। সংবিধানের ২৬ ধারায় ধর্মীয় সংগঠন ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে দেশের সমস্ত নাগরিকদের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে অথচ পরবর্তী ২৭ এবং ২৮ ধারায় হিন্দুদের সে অধিকার থেকে বঞ্চি ত করা হয়েছে। আবার সংবিধানে ৩০ ধারা সংযোজন করে দেশের মুসলমান, খৃষ্টান এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের শিক্ষাকেন্দ্র-গুলিতে নিজ নিজ ধর্মের শিক্ষাদান এবং প্রচারের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যারা দেশের রক্ষক তারাই, নিজেরা হিন্দু হয়েও, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অধিকার থেকে হিন্দুদের বঞ্চি ত করছে আর মুসলমান এবং খৃষ্টানদের আরও বেশী সুযোগ সুবিধে দেওয়ার ব্যবস্থা করছে। শুধুমাত্র তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকার সরকারি প্রতিষ্ঠান স্ট্রট্রড্রত্মব-র মাধ্যমে দেশের মনীষী, দেশপ্রেমিক এবং হিন্দুত্ববাদীদের সম্বন্ধে বিকৃত বা অসত্য তথ্য পরিবেশন করছে এবং বিদেশী, বিধর্মী আক্রমণকারীদের হিংস্র এবং নৃশংস কাজকর্ম আড়াল করে তাদের মহানুভব আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার হীন চক্রান্ত চলছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বাল্যকাল থেকেই দেশের প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সভ্যতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। এরপর আছে মুসলমানদের ব্যক্তিগত বা Muslim Personal Law। শরিয়তি আইন। এতে কারো হস্তক্ষেপ চলবে না। মুসলমানরা তাদের এই ব্যক্তিগত আইনের দোহাই দিয়ে হাইকোর্ট তো দূরের কথা সুপ্রীম কোর্টের রায়েরও তোয়াক্কা করে না। দেশের সংবিধানকেও তুচ্ছজ্ঞান করে। এদের তো এদেশে থাকার কোনও অধিকারই নেই। অথচ এদেরই খিদমদগারে পরিণত হয়েছে দেশের শাসকগোষ্ঠীরই একাংশ, অবশ্যই আরবীয় নোট এবং মুসলিম ভোটের লোভে। যাদের এদেশে থাকার অধিকার নেই তাদের সম্পর্কে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশের সম্পদের ওপর দেশের সংখ্যালঘুদেরই প্রথম অধিকার। জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী এবং কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকারের অন্তরাত্মা সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশ— জঙ্গিদমনের নামে সন্ত্রস্ত করা চলবে না মুসলমানদের। অথচ সবাই জানে সারা দেশে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে মদত দিচ্ছে কারা। সিমি একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। অথচ উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বললেন সিমি একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান; সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই। অথচ পুলিশি তদন্তে প্রকাশ সিমি-র সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যোগাযোগ রয়েছে। আর এক প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বললেন, মুম্বই বিস্ফোরণের জন্য দায়ী হিন্দু সন্ত্রাসবাদীরা। তিনি আরও বলেন দেশভাগের জন্য দায়ী হিন্দু মহাসভা, আর এস এস।

এতেও শান্তি নেই দেশের প্রশাসন ক্ষমতার অধিকারী রাজনৈতিক নেতাদের। তারা মুসলিম সমাজ অনুন্নত, দরিদ্র, অনগ্রসর। শিক্ষার আলোক বর্জিত প্রভৃতি কারণে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন, সাচার কমিটি, রঙ্গনাথন মিশ্র কমিশন-এর সুপারিশ অনুযায়ী। চাকরিতে সংরক্ষণ, শিক্ষাক্ষেত্রে সংরক্ষণ, মাদ্রাসাগুলিকে আরও বেশী অর্থ সাহায্য, মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন ছাড়াও নানা কিসিমের প্রতিশ্রুতি। স্বভাবতই দরিদ্র হিন্দুসমাজ এতে প্রলুব্ধ হবে এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে প্রবৃত্ত হবে। কারণ সারা ভরতে অতি দরিদ্র হিন্দুর সংখ্যা ২৩ কোটি

(এরপর ৯ পাতায়)

ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ ও কোরান

কমলাকান্ত বণিক

প্রখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত ঘোষাল একটি নিবন্ধে লিখেছেন, '....সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেলেও ইসলামিক সন্ত্রাসবাদ যে এক পাল্টা রাজনৈতিক বিন্যাস গড়ে তুলতে চাইছে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। ইসলামিক রাষ্ট্রজোট তৈরি হয়েছে। এই রাষ্ট্রগুলি সমবেত ভাবে বৈঠক করছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। তেলের জন্য আরব দুনিয়ার দেমাক কিছু কম নয়। এই রাষ্ট্রজোট দ্রুত এগোচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক বিকল্প শক্তি হিসাবে দুনিয়ায় মাথাচাড়া দেওয়ার জন্য। বিন লাদেন এই সাম্রাজ্যের মহানায়ক। মার্কিন কর্তাদের জন্য যেটা সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ সেটা হলো এই ইসলামিক রাষ্ট্রজোটের পিছনে আছে 'জিহাদ' নামক এক আবেগতাড়িত ধারণা। যে কারণে আত্মঘাতী হয়েও আজ বহু যুবক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ভারতে হামলা করতে প্রস্তুত। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর এক রচনায় লিখেছেন, পৃথিবীতে তিনটি জিনিস হলো এক্সট্রা র‍্যাশন্যাল বা বুদ্ধির ঊর্ধ্বে। সেগুলি হলো যুদ্ধ, ভালবাসা আর ধর্ম। রাসেল নিজে মনে করতেন এর মধ্যে আবার যুদ্ধ বিষয়টি হলো Anti Rational বা সহজাত বুদ্ধি বিরোধী ধারণা। বিন লাদেন গোষ্ঠী যে সন্ত্রাস চালাচ্ছে জর্জ বুশ যাকে যুদ্ধ বলেই চিহ্নিত করছেন, সেটার কোন্ বুদ্ধিতে ব্যাখ্যা মেলে? আমেরিকা, রাশিয়া, ইজরায়েল, বৃটেন সহ নানা দেশই আজ এই বুদ্ধি বিরোধী সন্ত্রাসের শিকার। কিন্তু মার্কিন গোয়েন্দাদের কাছেও আজ মস্ত বড় সমস্যা হলো এই ধর্মীয় উন্মাদনা বা আবেগ। ভারতীয় গোয়েন্দারাও মনে করছেন 'সুইসাইডাল স্কোয়াড'-ই হলো সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা। এই আত্মঘাতী বাহিনীর কার্যকলাপ আগাম জানা বা এদের আটকানো কঠিন, কেননা নিজেদের জীবনের প্রতি এদের কোনও মায়া নেই।...'

এবার জয়ন্তবাবুর নিবন্ধের উদ্ধৃত অংশের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়, তার কয়েকটি— ১। এই 'জিহাদ'-এর প্রেরণার উৎস কোথায়? ২। ইসলামী সন্ত্রাস বা 'জিহাদ'-এর লক্ষ্য কী? ৩। সেই লক্ষ্য অর্জিত হলেও পৃথিবীতে কি শান্তি আসবে? ৪। 'জিহাদ'-এ উৎসাহ দানের জন্য বিশেষত পারলৌকিক যে পুরস্কার বা উত্তেজক (incentive) কোরান ও হাদিসে ঘোষিত হয়েছে তা কি বাস্তব, যৌক্তিক ও নৈতিক? ৫। যৌক্তিক, বাস্তব বা নৈতিক না হলেও ইসলামী সন্ত্রাসীরা নিজের জীবনের প্রতি মায়াহীন হয়েও অপরের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করে কেন?

উপরোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর প্রসঙ্গে বলা যায়, প্রথমত, ১। ইসলামী সন্ত্রাস বা 'জিহাদ'-এর উৎস ইসলাম ধর্মের মূল পুস্তক কোরান, হাদিস ও রসুল মহম্মদ স্বয়ং, যিনি ৫৭০ খৃস্টাব্দে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং চল্লিশ বছর পেরিয়ে 'ইসলাম' নামক একটি ধর্মের প্রবর্তন করেন। ২। ইসলামী সন্ত্রাস বা 'জিহাদ'-এর লক্ষ্য অমুসলমানকে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করা। ৩। উক্ত লক্ষ্য অর্থাৎ সকল মানুষকে মুসলমান বানালেই পৃথিবীতে শান্তি নিশ্চিত হবে একথা মোটেই সত্য নয়। এযাবৎ কালের ইসলামের ইতিহাস তা যথেষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। ৪। কোরান ও হাদিসে 'জিহাদ-এ' উৎসাহ দানকারী যে সকল বক্তব্য আছে সেগুলি বাস্তব, যৌক্তিক ও নৈতিক কিনা তার উত্তর দেবার আগে আমাদের উক্ত বক্তব্যগুলির সাথে কিছুটা পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ক কিছু কথা কোরান ও হাদিস থেকে নমুনা হিসাবে উদ্ধৃত করছি ঃ

"তাদের (বিশ্বাসীদের) সেবায় নিয়োজিত থাকবে চির কিশোররা পানপাত্র, কুঁজো ও প্রস্রবণ নিসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালাসহ, ...ওরা তাদের পছন্দমতো ফলমূল পরিবেশন করবে এবং তাদের ঈপ্সিত পক্ষীমাংস এবং সুলোচনা সুন্দরীগণ সুরক্ষিত মুক্তসদৃশ তাদের কাজের পুরস্কার স্বরূপ। (কোরান ৫৬ ঃ ১৭-২৪) "তাদের জন্য সম্ভ্রান্ত শয্যাসঙ্গিনী থাকবে, ওদের আমি বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি—ওদের চির কুমারী করেছি, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা," (৫৬ ঃ ৩৪-৩৭) "তোমরা তাদের (অবিশ্বাসীদের) সাথে যুদ্ধ করতে থাকবে যে পর্যন্ত আল্লাহর ধর্ম (অর্থাৎ ইসলাম) প্রতিষ্ঠিত না হয়।..." (২ ঃ ১৯৩;৮ ঃ ৩৯) "যদি তোমরা অভিযানে বের না হও তবে তিনি (আল্লাহ) তোমাদের যন্ত্রণাপ্রদ শাস্তি দেবেন.... (৯ ঃ ৩৯) কোরানে অনুরূপ আয়াত— ৯ ঃ ৮৮;৪ ঃ ৭৪, ৯৫;৯ ঃ ২০, ৪১;৪৭ ঃ ৪;৪৮ ঃ ২০;৫৫ ঃ ৫৮, ৭০, ৭৪; ৭৮ ঃ ৩১-৩৪ ইত্যাদি। "জেনে রাখো, তরবারীর ছায়াতলে বেহেশ্‌ত বিরাজমান "(সহী আল বোখার) খণ্ড ৪;৭৩)

"যারা বেহেশ্‌তে প্রবেশ করবে তাদের প্রত্যেককে ৭২ জন হুরী (চিরযৌবনা অপরূপা কুমারী নারী) দেওয়া হবে,...." (মিশকাত শরীফ ৩য় খণ্ড পৃঃ ৮৩)

"বেহেশ্‌তে প্রবেশকারী মুসলমানকে একশত পুরুষের পুরুষত্ব দেওয়া হবে," (তিরমিজী শরীফ ২য় খণ্ড পৃঃ ১৩৮)

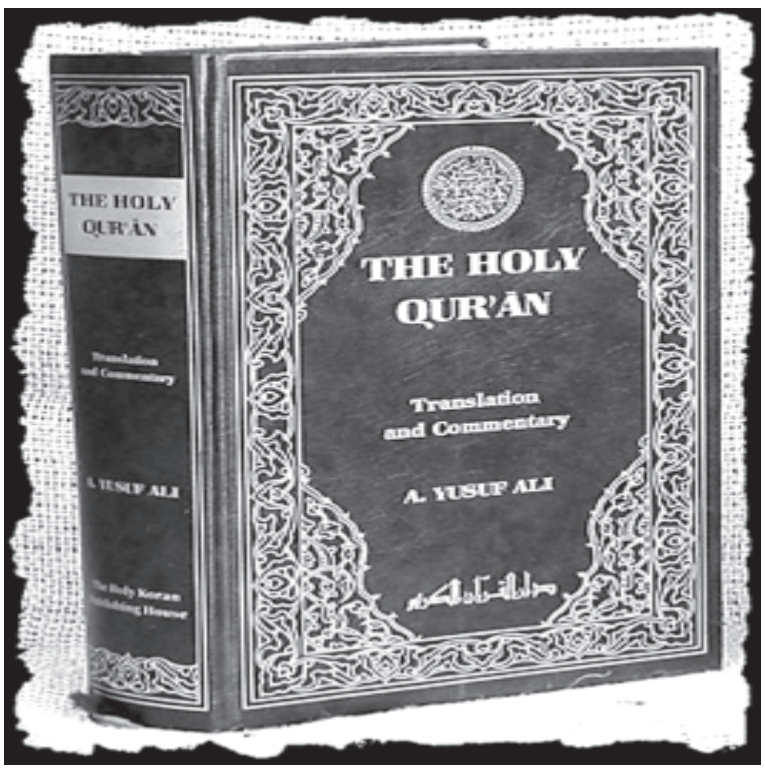

ইসলামের শুরু থেকেই ধর্মের ও আল্লাহর নামে আজ পর্যন্ত বিন লাদেনের মতো অত্যন্ত চতুর কিন্তু মতলববাজ মানুষ বিশ্বশান্তি ও সভ্যতাকে বিপন্ন করে আসছে। এবং তার ভিত্তি হচ্ছে কোরান ও তার প্রবর্তক নবী মহম্মদ। ওই মতলববাজ বিন লাদেন স্বয়ং নিরাপদে পর্থিব সকল প্রকার ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে কিছু আবেগসর্বস্ব মানুষকে ধর্মান্ধ বানিয়ে মানুষ মারতে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।

কাজেই ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরে এখন আমরা বলতে পারি, উপরে সামান্য যে কয়টি কোরানের আয়াত ও হাদিস উদ্ধৃত করা হয়েছে সেগুলি সাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও যদি যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করেন তবে বুঝবেন যে, কীভাবে মানুষকে তার পার্থিব জীবনের বাস্তবতা থেকে ভুলিয়ে কল্পনার বেহেশ্‌তের দিকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে, এবং এসব কথা অবাস্তব ও অযৌক্তিক তো বটেই, নৈতিকতার বিচারে অত্যন্ত কুরুচিকর ও জঘন্য তাতে সন্দেহ নেই। ৫। পাঠককে এবার আমরা ৫নং প্রশ্নটি স্মরণ করিয়ে তার উত্তর দেবার চেষ্টা করছি। এবং সেজন্য এখানে একটি কথা উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, মক্কা, মদিনা ও তৎপার্শ্ববর্তী আরবের উদ্দেশ্যেই কোরান রচিত হয়েছিল। এর সাক্ষী কোরান নিজে। যেমন— "এইভাবে আমি তোমার প্রতি আরবী ভাষায় কোরআন অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মক্কাবাসীদের সতর্ক করতে পারো..." (কোরান ৪২ ঃ ৭) "আমি এ (কোরান) তোমার ভাষায় সহজ করেছি যাতে তারা (তোমার প্রতিবেশীরা) সহজে বুঝতে পারে।" (৪৪ ঃ ৫৮)। অনুরূপ আয়াত কোরানে ৬ ঃ ৯৩;৩২ ঃ ৩;৪৩ ঃ ৩;৪২ ঃ ৭;৯ ঃ ১২০ ইত্যাদি।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, মক্কা মদীনা বা আরবের ওই অঞ্চলের মানুষদের ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ, খাদ্যাভ্যাস ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য হেতু স্বভাবতই তারা উগ্র স্বভাবের, প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ ও প্রবল যৌনবোধ সম্পন্ন হয়। ফলে প্রধানত যৌন সম্ভোগের জন্য বহুসংখ্যক অপূর্বসুন্দরী যুবতীনারী, সুরা ও সুস্বাদু খাদ্যের অঢেল ব্যবস্থা সমন্বিত বেহেশতের বর্ণনাসহ যে নিশ্চয়তা কোরান ও হাদিস দিয়েছে তা ওই আরবদের অনিবার্যরূপে চুম্বকের মতো আকর্ষণ করে। কোরান রচনাকারী তা জানেন বলেই কোরানে এই টোপটি অব্যর্থভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই বিষয়ে বাংলাদেশের অসাধারণ লেখক ইনসান বাঙাল তাঁর 'যুক্তিবাদীর চোখে নবী মহম্মদ ও কোরআন শরীফ' গ্রন্থে যথার্থই লিখেছেন, "জেহাদে নিহত বিশ্বাসীর জন্য আছে সাথে সাথে সুন্দরী কুমারীর অঢেল ব্যবস্থাসমন্বিত জান্নাত। অতএব কামতাড়িত মুসলমানের জেহাদে ভয় নেই, আছে প্রবল আকর্ষণ।" (২য় সংস্করণ পৃঃ ১৮৭-৮৮)।

কোরানে এমন কথাও বলা হয়েছে যে, বেহেশত বিশ্বাসীদের জন্য যৌনসম্ভোগের বিপুল ব্যবস্থাসহ আবাস, আয়েশ ও সুরার বিনিময়ে আল্লাহ তাদের পার্থিব জীবন ক্রয় করে নিয়েছেন (দেখুন কোরান, ৯ ঃ ১১১)। এ বড়ই প্ররোচনাদানকারী ভয়ংকর কথা। নিজের জীবন দিয়েও ইসলামী সন্ত্রাসবাদের কারণ এটাই।

ইসলামের শুরু থেকেই ধর্মের ও আল্লাহর নামে আজ পর্যন্ত বিন লাদেনের মতো অত্যন্ত চতুর কিন্তু মতলববাজ মানুষ বিশ্বশান্তি ও সভ্যতাকে বিপন্ন করে আসছে। এবং তার ভিত্তি হচ্ছে কোরান ও তার প্রবর্তক নবী মহম্মদ। ওই মতলববাজ বিন লাদেন স্বয়ং নিরাপদে পর্থিব সকল প্রকার ভোগ বিলাসে লিপ্ত থেকে কিছু আবেগসর্বস্ব মানুষকে ধর্মান্ধ বানিয়ে মানুষ মারতে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। সেই ধর্মান্ধ মানুষদের মগজ জুড়ে থাকে অবিলম্বে বেহেশত গিয়ে অনেক অপরূপা চিরযৌবনা নারীর সাথে দীর্ঘস্থায়ী মৈথুনের স্বপ্ন।

আশ্চর্য এই যে, ওই মরণখেলায় উন্মত্ত মূর্খেরা কিছুতেই বিন লাদেনদের চাতুর্য ধরতে পারে না। কিন্তু মরমী পারসী কবি ওমর খৈয়াম ইসলামের এই বেহেশতি প্রলোভনকে অস্বীকার করে যে সত্য কথাটা বলে গেছেন তার বাংলাটা এরকম— 'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও, বাকীর খাতায় শূন্য থাক। লাভ কি শুনে দূরের বাদ্য মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক। ধর্মনির্বিশেষে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ (মুসলমান সহ) যদি মনে করেন (এবং অবশ্যই মনে করা অপরিহার্য) যে, ধর্মীয় সন্ত্রাস মানব সভ্যতা ও শান্তির পক্ষে মহাবিপজ্জনক, তাহলে ইসলামধর্মীয় সন্ত্রাস যেহেতু কোরান ও হাদিস ভিত্তিক সুতরাং উক্ত গ্রন্থ সমূহের সংশোধন বা সংস্কার আশু প্রয়োজন। মানবতাবাদী মুক্তবুদ্ধি লেখক ইনসান বাঙাল তাঁর রচিত উপরোক্ত গ্রন্থের ৪০টি পরিচ্ছেদে বলেছেন, কোরান মুখ্যত বিশ্বমানবতার বিরোধী ধর্মান্ধতা সৃষ্টিকারী কু-উদ্দেশ্য প্রণোদিত এক যুক্তিহীন পুস্তক। এবং তিনি পুস্তকটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছেন।

ইসলামের সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ

(৮ পাতার পর)

মাত্র, আর অতি দরিদ্র মুসলমানের সংখ্যা সারা ভারতে ৪ কোটি। সুতরাং মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। বর্তমান রেলমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের অগ্নিকন্যা মুসলিম ভোটের তাগিদে তার ব্যানার্জী পদবী ত্যাগ করেছেন। এরপর মুসলমানদের আরও বিশ্বাসভাজন হতে হয়ত বা নিজের ধর্মত্যাগ করবেন, নামটা মমতাজ করবেন। তারপর, তারপর;নাহ্ আর ভাবা যাচ্ছে না।

অনেক মেধাবী হিন্দু হয়ত ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি পড়ার সুযোগ পেয়েছে, কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে পড়তে পারছে না, তারা ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হলে সরকার তার পড়াশোনার সব খরচ জোগাবে, এমনকী হোস্টেলে থাকা খাওয়ার খরচ পর্যন্ত। অন্ধ্রপ্রদেশের হাইকোর্ট ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ স্বীকার করেনি ধর্মত্যাগের প্রবণতা বৃদ্ধির আশঙ্কায়। তাতে কি? সরকার আছে তো! এর সঙ্গে আছে অনুপ্রবেশ। হিন্দু অনুপ্রবেশকারীদের ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বাংলাদেশে ফেরৎ পাঠানো হলেও মুসলমান অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে সাদরে গৃহীত হচ্ছে, প্রতিপালিত হচ্ছে। তাদের রেশনকার্ড হচ্ছে, ভোটার লিস্টে নাম উঠছে, তারপর হয়ত পঞ্চায়েত প্রধান হচ্ছে কিংবা পুরসভার কাউন্সিলার হচ্ছে। অর্থাৎ ভারত রাষ্ট্রের ইসলামীকরণ অতি দ্রুত এগুচ্ছে। সুন্দর ভাবে এগুচ্ছে।

পরিবর্তনের হাওয়া

বিভিন্ন স্কুল, কলেজ নির্বাচন, লোকসভা, বিভিন্ন উপনির্বাচনের পর পুরসভা নির্বাচনেও বিরোধীদের কাছে পর্যুদস্ত হলো বর্তমান শাসক দল সিপিএম তথা বামফ্রন্ট। অর্থাৎ এই সরকারের প্রতি সাধারণ মানুষের এখন আর যে আস্থা নেই তা প্রমাণিত। মানুষ চায় পরিবর্তন। দীর্ঘ বাম অপশাসনে মানুষ আজ অতিষ্ঠ, অবলুণ্ঠিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত। তাই বাম সরকারের অবসান চায় রাজ্যের জনগণ। সদ্যসমাপ্ত পুরনির্বাচনের ফলাফলে সেকথাই প্রমাণিত। লালদুর্গেও নেমেছে ধবস। তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচন বামনেতাদের কাছে হবে মরণবাঁচন লড়াই। যেনতেন প্রকারেণ ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা চালাবেই বাম নেতারা এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ তারা জানেন যে বিরোধী সরকার গঠিত হলে দুর্নীতির গোপন তথ্যগুলো ফাঁস হয়ে যাবে;বিলাসিতার জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে সর্বোপরি রাজ্যের সর্বত্র একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখা থেকে বঞ্চি ত হতে হবে। তবুও যদি সত্যিই রাজ্যে পালাবদল ঘটে তাহলে কি স্বর্গরাজ্যে উত্তীর্ণ হ'ব? বন্ধ হবে বন্ধ, অবরোধ, খুন সন্ত্রাসের রাজনীতি? রক্ষিত হবে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার? শিক্ষায় আসবে পরিবর্তন? সর্বোপরি জনসাধারণ কি পাবে দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন? যদি তা না হয় তাহলে রাজ্যবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। জবাবদিহি করতে হবে সাধারণ মানুষের কাছে।

কিন্তু পরিবর্তনের হাওয়ায় যদি বিধানসভা নির্বাচনের পর রাজ্যে অরাজকতার অবসানে নতুন যুগের সূচনা হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে তৃণমূল নেত্রী। কারণ ভুললে চলবে না এই মমতা ব্যানার্জীই মুসলিম তোষণে অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে থাকেন। মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মুসলিম পোষাক পরতে, নামাজ পড়তে, মন্ত্রী হিসেবে মুসলিমদের সুযোগসুবিধা দিতেও পিছপা হননি। এ ঘটনা কি নির্লজ্জতাকে প্রমাণ করে না? এ হেন ভূমিকায় রাজ্যে হিন্দু নর-নারীর নিরাপত্তা জনিত অভাব দেখা দিলেও অবাক হবার কিছু থাকবে না। এছাড়াও তৃণমূল নেত্রীর জেদী মনোভাব, হঠকারী সিদ্ধান্ত রাজ্যের ভবিষ্যত কর্মপন্থাকে বিপথগামী করতে পারে। সর্বোপরি সিপিএম বিরোধিতায় যে জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করলেন সেই কংগ্রেসের সঙ্গেই জোট করার অর্থ চরম রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষণ নয় কি? তাহলে স্বতন্ত্র দল করার যৌক্তিকতা কোথায়? তাই আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সরকার পরিবর্তন হলেও মমতা নিজেকেও পরিবর্তন করবেন কি? না হলে উন্নততর বাংলা, সমৃদ্ধ বাংলা, শিক্ষিত বাংলা, সবুজ বাংলা সর্বোপরি সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে না। মা-মাটি-মানুষের লড়াই বৃথা হয়ে যাবে।

—সমীর কুমার দাস, দ্বারহাট্টা, হুগলী।

'ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর'

'ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ...' শীর্ষক প্রতিবেদনে (স্বস্তিকা, ২৪/৫/১০) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে "ডাঃ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই 'ডাঃ' কথাটি প্রযোজ্য। প্রতিবেদক মহাশয়, মনে হয়, 'ডঃ' কথাটির জায়গায় 'ডাঃ' কথাটি ব্যবহার করে ফেলেছেন। পরিশেষে, একটি কথা। নিরলঙ্কার 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর' নামটির সাথে কোন অভিধা যোগ করা অনাবশ্যক এবং বিভ্রান্তিকর।

—বিমলেন্দু ঘোষ, কলকাতা।

রাজনীতির হিন্দুকরণ

হিন্দু হিন্দু করে জনজাগরণ করে হয়তো হিন্দুর সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালানোর বহর বাড়তে পারে, নাম সংকীর্তন বাড়ানো যেতে পারে, পুজোর ঘটা বাড়তে পারে কিন্তু ১০০০ বছরের হিন্দুর যে পরাধীনতা যথা—জোর করে মুসলিম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে গো-কুরবানী করা, হিন্দুর গ্রামলুঠ, জমির ধান লুঠ, হিন্দুর মেয়ে লুঠ—কি কমবে? হিন্দুর অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি। সেটার সমাধান কিভাবে সম্ভব? সবাই জানে সাপ মারতে লাঠির দরকার হয়। আর যদি সে সাপ বিষধর কাল সাপ হয় তবে তো কথাই নেই। লাঠি, চৌকি, রড, অ্যাসিড আবার সবশেষে আগুনে পুড়িয়ে দিয়ে তবেই নিশ্চি ত হওয়া যায়। যে ভারতে মুসলমান রাজত্বে শিবাজী মহারাজ, রাণাপ্রতাপের মতো হিন্দুর আবির্ভাব ঘটেছিল। হিন্দু আজ হিন্দুরাষ্ট্রের কথা মুখেও আনে না। হাজার অত্যাচারের পরেও বলে আমরা ভাই ভাই। আর তাই আজ হিন্দুর মুঘল যুগের ন্যায় অস্ত্র ধারণ করার ক্ষমতা নেই। আজও হিন্দু মাথা তুলে হিন্দুত্বের কথা বলতে পারে না। হিন্দু আজও তীর্থকর দিতে বাধ্য হয়। তাই সেই হিন্দু অধিকার ফিরিয়ে আনতে প্রয়োজন রাণাপ্রতাপ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ, লক্ষ্মীবাঈ, সুভাষচন্দ্রের।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে যদি আজাদ-হিন্দের প্রশস্ত সংগ্রাম ও নৌবিদ্রোহ ও একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ না হোত তবে এতদিনে সমগ্র ভারতবাসী চরকা কেটেই চলত। জনপ্রতিরোধ করে কোনও একটা সরকারকে বিব্রত করা যায় মাত্র—তার বেশি কিছু নয়।

ভারতবর্ষে হিন্দু বিপ্লবের চিরপথিক বীর সাভারকরের সুরেই বলতে চাই—"Mass Resistance of the Hindu people in nothing but a misuse of labour"..."Hinduise all Politics"..."Militarise Hindudom–"Down with arms act, start Rifle Classes." অর্থাৎ হিন্দু গণ প্রতিরোধ হলো পণ্ডশ্রম। রাজনীতির হিন্দুকরণ চাই, হিন্দু জগতের সামরিকীকরণ আবশ্যক। অস্ত্র আইন ধ্বংস করে, রাইফেল শিক্ষার পাঠ শুরু হোক।

—বিজয় দে, ডায়মণ্ডহারবার।

ফুল নিয়ে হুলস্থুল

বাংলার ৮১টি পুরসভায় এবার হয়ে গেলো বসন্ত উৎসব। চারদিকে এখন চলছে ফুল নিয়ে হুলুস্থুল। তৃণ থেকে যে এত ফুল ফোটবে তা লালবাবুরা ভাবতেও পারেনি। এখন লালবাবুরা বসে বসে ভাবছেন, ফুলতো ফোটলো; কিন্তু এই ফুলে ফল কি হবে? যদি হয়, তবে সেই ফলের বীজ পড়ে তৃণ যদি অরণ্যে রূপান্তরিত হয়, এখন কি হবে? লাল বাবুরা এখন গালে হাত দিয়ে বসে এসবই ভাবছেন। এমনি সব কথায় কথায় প্রসঙ্গ হারিয়ে যায় চলমান রেলগাড়ীর নিত্যযাত্রী মহলে। এককথায় দশ কথা হয়। জনৈক প্রবীণ যাত্রী বললেন—আমরা হলাম অবচেতন সচেতন মনুষ্য সমাজের চলমান রেলযাত্রী। তা না হলে চীন রাশিয়া থেকে রপ্তানি করা বিষ ফলের বিষবৃক্ষ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে কি করে? এই সব বিষবৃক্ষের বিষাক্ত বাতাস সারাদেশে কি ভয়ংকর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে! এই সব বিষবৃক্ষের মূলোচ্ছেদের জন্য আমরা কি কখনো হাত লাগিয়েছি?

এই কথাটা সত্তর দশকে কেউ রেলগাড়ীর নিত্যযাত্রী মহলে বললে প্রতিবাদের ঝড় উঠতো। এখন সকলেরই এক কথা—তা ঠিকই বলেছেন মহাশয়। তবে ঘাস ফুলই ফুটক বা পদ্মফুল ফুটুক, ফুলের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাবে, বিষাক্ত বাতাসও তত পরিচ্ছন্ন হবে। আর বিষবৃক্ষ, তাও ধীরে ধীরে নির্মূল হবে। এখন এমনি সব তর্ক বিতর্ক পরিহাস প্রতিবাদ শুধু রেল গাড়ীর নিত্যযাত্রী মহলে সময় কাটাবার জন্যই সীমাবদ্ধ নয়; এখন এমনি সব আলোচনা সমালোচনা চলছে সর্বত্র। এরই মাঝে গতানুগতিক নিয়মে হাত তুলে সরে যাবার লোকেরও অভাব নেই। তারা বলেন— এতো প্রাচীন প্রথা। এক রাজার রাজপাট দখল করতে অন্য রাজার প্রস্তুতি। অতএব মাথার ঘাম পায়ে ফেলে লাভ নেই। চলছে চলবে এটাই প্রধান স্লোগান। আপাতত এখানেই থাক। দু'চারটা মারদাঙ্গা হাঁকডাক সেকাল একালের নিয়মে চলছে চলবে। মাওবাদী লেলিনবাদী বা তুর্কিবাদী বর্গীবাদী রাজনীতিকদের নানা রকম সংগঠনের অভাব নেই। দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন প্রাচীন প্রবাদ। রাজপাট দখলের জন্য স্তুতিবাক্য সীমাহীন। মহামান্যগণের নাটক দেখবো গতানুগতিক নিয়মে। নূতনকে স্বাগত জানাবো পুরাতনকে বিদায় জানাবো। এই একই নিয়মে এখন আমরা পুর এলাকায় ঘাসফুলে ঘর সাজানো দেখছি। দেখবো কৃষ্ণচূড়া ফুলের লাল রঙের মতন তেরঙ্গা ঘাসফুলের রঙ কতদিন উজ্জ্বল থাকে। তারপর আবার হয়তো ফোটবে কোনও নূতন ফুল। তখনও আবার শুরু হবে ফুল নিয়ে হুলুস্থুল, এটাইতো গতানুগতিক নিয়ম। আপাতত রেলগাড়ীর নিত্যযাত্রী মহলের গালগপ্পো এখানেই থাক। ঘাসফুল নিয়ে এখন পুরসভায় যা চলছে হাঁকডাক।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, অশোক নগর, উত্তর ২৪ পরগনা।

রূঢ় বাস্তব

স্বরাজ রঞ্জন ভট্টাচার্য

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারি যে কুমারী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি মুসলমানদের সঙ্গে নমাজ পড়েছেন এবং তাঁহার "বন্দোপাধ্যায়" পদবী পরিত্যাগ করেছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে একমাত্র বিবাহ ছাড়া পদবী পরিত্যাগ করলে নিজের বংশ-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হয় এবং নিজেরও মান-মর্য্যাদার হানি ঘটে। এমতাবস্থায় সাধারণের মনে ঘৃণার সঞ্চ ার হোতে পারে। তাই, ভোট একাধারে যেমন বাড়তে পারে আর একাধারে কমে যাবারও সম্ভাবনা থাকে।

তারপর ইস্‌লাম ধর্মে আছে যারা কলমা পড়ে "লা ইলাল্লাহ্ মহম্মদর রসুলুল্লাহ্" বলে নবী, মহম্মদ রসুলের নিকট আত্মসমর্পণ না করবেন, তাদেরকে মুসলিম বলে গণ্য করা হবে না। তাদেরকে কাফের বলে গণ্য করা হবে। এই কাফেররাই হলো আল্লাহ'র শত্রু এবং ঘৃণ্য নরপশু (কোরানে উদ্ধৃ ত আয়াত ৭/১৭৯)। এই কাফেরদের জন্য আল্লাহ্ মর্মান্তিক শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন (আয়াত ৪/১৪৫-১৪৬, ওই ৮/১০-১৪)। এখানে উল্লেখ্য যে মমতা খাতুন না মমতা দেবী অর্থাৎ পদবী পরিত্যাগে কি লিখব ভেবে পাই না। আবার শুধু মমতা লিখলে অশালীন হবে কিনা তা-ও বুঝি না। যাই হোক্। মাননীয়া মমতা কি কলমা পড়েছেন? এবং ওই উক্তি করে মহম্মদ রসুলের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন? তা না হোলে আপনি কি কাফের রয়ে গেলেন না?

এহেন পরিস্থিতি মৌলবাদী ইমামরা কেমন করে সহ্য করলেন? এবার কি তাঁদের ভাবাবেগে আঘাত লাগল না? এ নিয়ে পশ্চি মবঙ্গের সমস্ত গণমাধ্যম এখন নীরব কেন? যত দোষ নরেন্দ্র মোদী, তসলিমা নাসরিন এবং অন্যান্যদের! তাই, স্পষ্ট মনে হয়, সাম্প্রদায়িকতার যত উস্কানিদাতা সব ধর্মনিরপেক্ষ দল এবং গণমাধ্যম।

কোরাণে আরও আছে নারী পুরুষের শস্যক্ষেত্র। পুরুষ তাঁর শস্যক্ষেত্রে যদৃচ্ছা গমন করবে এবং ভোগ করবে, এখানে কেউ কাউকে বাধা দেবেন না (আয়াত ২/২২৩) /;তা-ও আবার ধনী রাজা-বাদশাদের জন্যে। যদি দরিদ্র দুর্বল জন হন, তবে তাকে ইটপাটকেল ছুঁড়ে মেরে ফেল, না হয় তা'র চোখ সাঁড়াশী দিয়ে টেনে খুলো।

এবার আসা যাক্ রিজওয়ানুর কাণ্ডে। রিজওয়ানুরের অপমৃত্যুতে দেশশুদ্ধো অধিবাসীদের অধিকাংশই দুঃখিত ও পীড়িত। এমন অনেক রিজওয়ানুর তো অহরহ মরছেন মরবেন। এ নিয়ে গণমাধ্যমের তো কোনও মাথাব্যথা দেখি না। একমাত্র রিজওয়ানুরের বেলায় তাঁদের এতটা হৈ চৈ কেন? যতদূর জানা যায় রিজওয়ানুর আত্মহত্যা করেছেন, খুন হননি। এজন্যে মমতাজী যা করেছেন এবং করে চলছেন তা অভাবনীয়। তাই,

জনমত

আর একটু উর্ধ্বে গেলে ক্ষতি কি? এ ব্যাপারে জানাই যে বিধবা পত্নীদের যদি স্বামীর বাড়ীতে যেতে বা থাকতে চান কিনা এবং তাঁর প্রিয়জনেরা তাঁকে ফিরে পেতে চান কিনা মমতাজী এ নিয়ে তদন্ত করুন না। তারপর প্রিয়াঙ্কা'র উদ্ধারকার্যে আন্দোলনে নামুন। তবে তো তা'র ফলাফল বোঝা যাবে। মহাকরণের দ্বিতীয় তল থেকে তথ্যকেন্দ্র সরানো এবং সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনে মমতাজী তো কৃতকার্য হয়েছেন। এবার প্রিয়াঙ্কা উদ্ধারে আন্দোলন করে দেখুন না কি হয়!

টোডি যদি কিছু করে থাকেন, কোরানের নির্দেশ মেনেই তো তা করে থাকবেন। যেহেতু, কোরানের ২/২২৩ আয়াত রিজওয়ানুরের মতো দরিদ্র দুর্বল ব্যক্তি'র জন্য নয়। ইহা হবে প্রবল পরাক্রান্ত রাজা-বাদশাদের জন্য। অতএব, এ ব্যাপারে টোডিকে কোনও দোষ দেওয়া চলে না।

তবু আজ সারা পশ্চি মবঙ্গে সি পি আই (এম)-এর যে অত্যাচার, অনাচার, লুঠ-লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হরণ ইত্যাদি অবাধে চলছে—সেই বিভীষিকা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে যে প্রয়াস, এ ব্যাপারে পশ্চি মবঙ্গে মমতা'র কোনও জুড়ি নেই। এমন কাজে মমতা যে শুধু প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য তা নয়, সারা পশ্চি মবঙ্গবাসী অকাতরে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। তাঁর নিজেরও একবার মাথা ফেটেছিল এমন কাজে। সেদিনের কথা মানুষ আজও ভুলতে পারবে না।

তবু চাঁদের যেমন কলঙ্ক আছে, তেমন মমতা'র কাজেও একটু খুঁত আছে, যা উল্লেখ না করে পারছি না।

অনেক অপ্রিয় সত্য বাক্য পরিবেশন করলাম। সেজন্য অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী। তবু যা লিখেছি, তা "রূঢ় বাস্তব"।

গ্রাহকদের জন্য

স্বস্তিকার সডাক্ বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ২০০.০০ টাকা। বিশেষ সংখ্যাগুলি সমেত।

স্বস্তিকার গ্রাহক হতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ নাম ও ঠিকানা (পিন কোড নম্বর সহ) এবং ফোন নম্বর (যদি থাকে) স্পষ্টাক্ষরে লিখে পাঠাতে হবে। বছরে যেকোনও সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়।

পত্রালাপের সময় অবশ্যই আমাদের দেওয়া গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করবেন। মনে রাখবেন গ্রাহক নম্বরের পাশেই যে তারিখটি লেখা হয় সেই তারিখেই আপনার গ্রাহক মেয়াদ শেষ হচ্ছে। অতএব উক্ত তারিখের পূর্বেই পরবর্তী বছরের জন্য নির্ধারিত বার্ষিক গ্রাহক মূল্য জমা দিয়ে গ্রাহক মেয়াদ নবীকরণ করতে হবে।

স্বস্তিকা দপ্তর থেকে প্রতি সপ্তাহে সোমবার পত্রিকা ডাকে দেওয়া হয়। সময়মতো পত্রিকা না পেলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নেবেন। বারবার ডাকের গোলমাল হলে Chief Post Master General, West Bengal Circle, Yogajog Bhawan, P-36, C.R. Avenue, Kolkata - 12 — এই ঠিকানায় লিখুন।

— ব্যবস্থাপক

।। স্বামী বিবেকানন্দের ১০৯তম তিরোধান দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত।।

ব্রাদার বিবেকানন্দ

নির্মল কর।। সিমলে পাড়ার বিলে ওরফে নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস গ্রহণের আগে 'ফ্রিমেসন' (Freemason) ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি হলেন ব্রাদার নরেন্দ্রনাথ। ১৮৯৪ সালের ১৫ এপ্রিলের 'বোস্টন ইভনিং ট্রান্সক্রিপ্ট' লিখেছে শিকাগোর ধর্মসম্মেলন সম্পর্কে যাঁদের আগ্রহ আছে, তাঁদের প্রত্যেকে জানেন ব্রাদার বিবেকানন্দকে। সন্ন্যাস-গ্রহণের পর নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হলেও প্রথম প্রথম আমেরিকায় নিজেকে তিনি ব্রাদার বিবেকানন্দ বলে পরিচয় দিতেন, স্বামী বিবেকানন্দ নয়। সাম্যবাদীরা যেমন তাঁদের সহযোগীদের 'কমরেড' বলে সম্বোধন করেন, তেমনি 'ফ্রিমেসন্' সংস্থার সদস্যদের বলা হোত 'ব্রাদার'।

কিন্তু ফ্রিমেসন কারা, আর ফ্রিমেসন্‌রি ব্যাপারটাই বা কী? পরস্পর সহযোগিতা এবং ভ্রাতৃ-প্রেমের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এটি একটি গুপ্তসমিতি। ফ্রিমেসন্‌রা এক বিশাল আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য, যাঁরা বিশ্বের বহুদেশে ছড়ানো। একটি নৈতিক আন্দোলনই এই সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত। Mason বা স্থপতি যেমন সুন্দর প্রাসাদ বা গির্জা তৈরি করেন, ফ্রিমেসন্‌রাও তেমনি নিজেদের জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলেন। এই সংগঠনের রীতিনীতি এবং কার্যকলাপ কিছুটা গোপন রাখা হোত। অনেক স্বৈরাচারী দেশ এই সংস্থাকে অবৈধ ঘোষণা করলেও পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রে এর শাখা-প্রশাখা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৭২৭ সালে কলকাতায় 'এন্‌কার অ্যান্ড হোপ' নামে একটি ফ্রিমেসন্ লজ বা সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় এক শতাব্দী পর হিন্দুরা এর সদস্যপদ লাভ করেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই সংস্থার সদস্য হতে পারেন। নাস্তিক এবং মেয়েদের প্রবেশাধিকার ছিল না।

১৮৮৪ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি নরেন্দ্রনাথ দত্ত 'এন্‌কার অ্যান্ড হোপ' লজ-এর সদস্যপদ প্রাপ্তির পর 'ব্রাদার' নামে পরিচিত হন। লজের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন ডবলিউ সি বোনার্জি, রাসবিহারী ঘোষ, তারকনাথ পালিতের মতো বিশিষ্টজনেরা।

ফ্রিমেসন্‌রি নৈতিকতার একটি বিশেষ ব্যবস্থা, যা রূপকে ঢাকা এবং প্রতীকে চিত্রিত। বলা হয়েছে, Freemasonry is a peculiar system of morality, veiled in allegory and illustrated by symbols. এর মহতী নীতি তিনটি—ভ্রাতৃপ্রেম (brotherly love), সেবা (relief) আর সত্য (truth)।

বিবেকানন্দের জীবনীকারদের রচনায় দেখা যায়, নরেন্দ্রনাথ ফ্রিমেসন হয়েছিলেন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধের জন্যে। অনুজ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা বিবেকানন্দের জীবনীতেও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন, '....নরেন্দ্রনাথের ভবিষ্যৎ কাজকর্মে আরও উন্নতি করে দেবার জন্যে পিতা ওকে ফ্রিমেসনরির সদস্য করে দেন।' ভূপেন্দ্রনাথ পাদটীকায় লিখেছেন, 'এই সময় ভারতবাসীদের মধ্যে ফ্রিমেসনরির সদস্য হওয়া একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।' বহু আইনজীবী, বিচারক আর সরকারি কর্মচারীও এর সদস্য ছিলেন। এর সদস্যপদ লাভের ফলে উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশা করবার সুযোগ পাওয়া যেত। কিন্তু সংস্থার সদস্যপদ প্রার্থীদের এই মর্মে মুচলেকা দিতে হোত যে, তাঁরা কোনও আর্থিক বা অন্যায় মতলব নিয়ে সংস্থায় যোগ দিচ্ছেন না।

আঠারো বছরের যুবক নরেন্দ্রনাথ ওই সময় বিভিন্ন ধর্মীয় ও নৈতিক প্রতিষ্ঠানের মূল তত্ত্ব জানতে ব্যগ্র ছিলেন। তাঁর সহপাঠী আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলও ১৮৮১ সালে নরেন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনে মানসিক ঔৎসুক্যের কথা জানিয়ে লেখেন, 'সে বিভিন্ন গুরু, ধর্মমত ও ধর্মীয় প্রথা পরখ করে দেখত—He tried to divine teachers, creeds and cults. ফ্রিমেসন্‌রি সংস্থাকে নরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট যাচাই করে তবেই সংস্থায় যোগ দেন।

নরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় পর্যায়ে লজের 'ফেলোক্রাফ্‌ট' হন ১৫ এপ্রিল ১৮৮৪ আর তৃতীয় পর্যায়ে 'মাস্টার মেসন' হন ওই বছরের ২০ মে। তিন মাসের মধ্যে তিনটি পর্যায় অতিক্রম করে তিনি পূর্ণ ফ্রিমেসন্ হন এবং ব্রাদার নরেন্দ্রনাথ দত্ত বলে পরিচিত হতে থাকেন। সন্ন্যাসী হয়েও তিনি ব্রাদার বিবেকানন্দ নামে পরিচিত হতে চাইতেন। প্রসঙ্গত, নরেন্দ্রনাথকে ফ্রিমেসন্ হতে আমেরিকায় একটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়। কিন্তু অন্যত্র বক্তৃতার ব্যবস্থা থাকায় ওই সময় আমেরিকান লজের সভায় তিনি যোগ দিতে পারেননি। বিষয়টি ১৮৯৪ সালের ২২ জানুয়ারি এক চিঠি থেকে জানা যায়—

Gilbert W. Bernard, Esqr.
Masonic Temple, Jan, 22, 1894
Chicago Illinois.
My dear Brother,

I take very great pleasure in introducing to you personally, and as a Freemason, our East India Brother SWAMI VIVEKANANDA, Whom I examined in the English Work, in which he has made, a Master Mason, in ANCHOR AND HOPE, 236, E.C.

....I will add that I am here to attend the convention of all the Lodges in this city tonight, and the Brethren are very much disappointed that his lecture engagement present Brother Vivekananda from being with us.

Sincerely yours,
Connoor G.C.

সন্ন্যাসী হয়েও বিবেকানন্দ ফ্রিমেসন্‌রিকে ভুলতে পারেননি, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। কারণ, ফ্রিমেসন্‌রি তাঁর সমগ্র জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত, তার মূল তিনটি নীতি—ভ্রাতৃপ্রেম, সেবা আর সত্য।

খড়দহ গোস্বামী পাড়া ও বিশ্বাসপাড়া

ডঃ প্রণব রায়

॥ ২॥

খড়দহের শ্যামসুন্দরজীউর মন্দিরের প্রসিদ্ধি থাকলেও বাবুঘাটে 'বিশ্বাসপাড়া'র 'ছাবিবশ শিবমন্দিরে'র নাম অনেকের কাছে অজানা। মন্দিরগুলি সবই গঙ্গাতীরবর্তী এবং 'আটচালা' রীতির। প্রথমে কুড়িটি মন্দিরের একটি বৃত্ত নিয়ে এক ঠাকুরবাড়ি। অপর ছয়টি শিবালয়, একটি আলাদা ঠাকুরবাড়ি। প্রবেশপথে একটি লিপি থেকে জানা যায় রামহরি বিশ্বাসের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস এই শিবালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিটি মন্দিরেই একটি করে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সব মন্দিরগুলিই খুবই অনাদৃত ও অবহেলিত। উত্তরদিকের প্রবেশদ্বারের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মন্দির খুবই ভঙ্গুর ও বৃক্ষসমাকীর্ণ। দু-একটি মন্দির ছাড়া বাকীগুলি সবই অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন এবং পুজোপাঠও হয় না। মন্দিরগুলি সবই প্রাচীর বেষ্টিত। কুড়ি ও ছয়টি শিবালয়ের মাঝখানে গঙ্গায় একটি স্নানঘাট ও উন্মুক্ত 'চাঁদনি'। মন্দিরসমূহে কোনও অলংকরণ নেই। আনুমানিক আঠার-উনিশ শতকে মন্দিরগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়।

'গোস্বামী'পাড়ায় রাধাশ্যামসুন্দরজীউর 'আটচালা'-রীতির বিশালাকার মন্দির খুব বেশিদিনের পুরানো না হলেও দেববিগ্রহ রাধাশ্যামসুন্দর শ্রীশ্রী নিত্যানন্দ প্রভু প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত বলে জানা যায়। এর চারপাশ প্রাচীরবেষ্টিত। উত্তর দিক দিয়ে মন্দিরচত্বরে প্রবেশ করা যায়। ইঁটের তৈরি মন্দির হলেও কোনও অলংকরণ নেই। শ্যামসুন্দরজীউ কষ্টিপাথরে তৈরি হলেও রাধিকা অষ্টধাতু নির্মিত। এখানকার প্রধান উৎসব 'রাস'। সেসময় প্রচুর খিচুড়ি ভোগ হয়। শ্যামসুন্দরমন্দিরের পার্শ্ববর্তী রাধামদনমোহনজীউর অপর একটি বৃহদাকার 'আটচালা' মন্দিরের প্রবেশপথে একটি লিপি থেকে জানা যায়, সেটি ১২৯১ সাল বা ১৮৮৪ খৃস্টাব্দে নির্মিত। রাধাশ্যাম-সুন্দরজীউর মন্দির আরও পুরানো মনে করা যায়। গঠনশৈলী দেখে সেটি খৃষ্টীয় আঠারো শতকের শেষ বা উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তৈরি হয় বলে মনে করা যায়।

এই ঠাকুরবাড়ির কিছুটা দূরে রাস্তার ধারে 'কুঞ্জবাড়ি' নামে পরিচিত স্থানে প্রভু নিত্যানন্দ ও তৎপুত্র বীরভদ্রের বাস্তুভিটা বর্তমান। পুবমুখী একটি 'দালান' মন্দিরের তিনটি কক্ষে প্রথমে বীরভদ্রের কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি ও তার নিচে সম্ভবত মালা জপরত পুরন্দর পণ্ডিত। মাঝখানের প্রকোষ্ঠে গৌর-নিতাই-এর সংকীর্তনরত কাষ্ঠমূর্তি। একেবারে ডাইনে শেষের কক্ষে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা মূর্তি। অদূরে বহু চূড়াযুক্ত একটি বৃহৎ রাসমঞ্চ বর্তমান। রাধাশ্যামসুন্দরজীউর প্রসিদ্ধ রাসের সময় এখানে বিগ্রহদের এনে পুজোপাঠ হয়। 'কুঞ্জবাটি'র প্রবেশ পথের ভেতরে একটি লিপি থেকে জানা যায় এটি ছিল প্রভু নিত্যানন্দের পুত্র বীরভদ্র ও কন্যা গঙ্গামণি দেবীর জন্মস্থান।

খড়দহ-গোস্বামীপাড়ার কিছুটা উত্তরে মহাপ্রভুর একটি উচ্চ নবরত্নমন্দির খুবই দর্শনীয়। আলোচিত সব মন্দিরেরই কোনও স্থানে কোনও অলংকরণ নেই।

বাংলার মন্দিরে মন্দিরে

সুদৃশ্য 'দেউল' মন্দিরের বর্তমান দৈন্যদশা। রঘুনাথবাড়ি (অযোধ্যা), চন্দ্রকোণা, পশ্চিম মেদিনীপুর।

কর্মযোগ

ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষ প্রভূত উন্নতি করলেও প্রকৃতির রোষের কাছে আজও সে অসহায়। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট অনুযায়ী গত দু'দশকে বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ। দুর্যোগ সততই অনিশ্চিত। এর মোকাবিলায় নিজেদের প্রস্তুত রাখাই বুদ্ধির কাজ। ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিষয়টি তাই আজ অত্যাবশ্যক। ভারত সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে দশম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার থেকেই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বিষয়টিকে স্কুল ও পেশাদারি শিক্ষার অন্তর্গত করতে অনুমোদন করা হয়। দূরশিক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (১-৪ বছরের) এবং সার্টিফিকেট কোর্স (৬ মাস থেকে দু'বছর)। প্রথমটি স্নাতকদের জন্য আর দ্বিতীয়টি উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল্য পরীক্ষা দিয়েই করা যায়। দিল্লির ইন্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট অব ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে সিকিম মণিপাল ইউনিভার্সিটি অব্ হেলথ, মেডিকেল অ্যান্ড টেক্‌নো-লজিক্যাল সায়েন্সেস-এ স্নাতকরা মাস্টার্স ইন ডিজাস্টার মাইগ্রেশন কোর্সটি করতে পারেন। স্নাতক বা প্রফেসন্যাল যে কেউ এই পাঠক্রমের জন্য আবেদন করতে পারেন। এই কোর্স করা থাকলে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ইনসিয়োরেন্স কোম্পানি, বৃহৎ শিল্প—সংস্থা বিশেষত রাসায়নিক, পেট্রোল ও খনিক্ষেত্রে চাকরি পাওয়া যায়। রেডক্রস এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের চাকরিও আছে।

মানবাধিকার নিয়ে পড়াশুনো

হিউম্যান রাইটস আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল পশ্চিমের দেশগুলিতে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মানবাধিকার আন্দোলনে গুরুত্ব পেয়েছে দেশের সমাজ, সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যও। আর ভারতের মতো দেশে, যেখানে বিভিন্ন ভাষা, ধর্ম ও বর্ণের মানুষের বসবাস, সেখানে মানবাধিকারের প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মানবাধিকার বিষয়টি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকারও অন্তর্গত।

যে কোনও বিষয়ে সম্মানিক স্নাতক করা থাকলে হিউম্যান রাইটস নিয়ে স্নাতকোত্তর কোর্স করা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বালিগঞ্জ ক্যাম্পাসে এই বিষয়টি পড়ানো হয়। আবেদনকারীদের একটি মৌখিক পরীক্ষায় বসতে হয়। কোনও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

নয়া দিল্লির ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব্ হিউম্যান রাইটস-এ ছভ্রভ্রভ্র. ভ্জনন্ধড়ন্ধন্দন্দবস্তু.তন্দবন্ধঙ্গ ত্রম্মাম্মাপ্তন.ড়ন্ধতগ্ন মানবাধিকার সংক্রান্ত দু'বছরের পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স করানো হয় করেসপন্ডেন্স কোর্সে। 'ইগনু'তেও ছভ্রভ্রভ্র. নন্ধপ্সতত্রস্তু.নতগ্ন এই বিষয়ে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সার্টিফিকেট কোর্স করানো হয় দূরশিক্ষার মাধ্যমে। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছ'মাস থেকে দু'বছর পর্যন্ত।

যোগ্যতা : উচ্চমাধ্যমিক বা সমতুল্য/ এইসব কোর্স করার পর বিভিন্ন দেশি-বিদেশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় কাজের সুযোগ রয়েছে।

উইমেন স্টাডিজ

বিশ্বায়নে মেয়েদের ব্যবহার' সর্বশিক্ষা অভিযানে নারীর ভূমিকা থেকে মনুসংহিতায় নারীর অবস্থান ও মর্যাদা নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণ করাই হলো উইমেন স্টাডিজের বিষয়বস্তু। নারী-শিক্ষা নয়, নারী কেন্দ্রিক শিক্ষা, বিষয়ের পুরোভাগে মেয়েরা। নারী-আন্দোলন নয়, নারীবাদও নয়, মানবীবিদ্যা সম্পূর্ণ এক ব্যবহারিক শিক্ষা।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কোর্স— এম ফিল ইন উইমেন স্টাডিজ। যে কোনও বয়সের যে-কোনও শাখার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট এমনকী ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার আর্কিটেক্টরাও পড়তে পারেন। ভর্তির জন্য প্রতি বছর এপ্রিল-মে মাসে বিজ্ঞপ্তি বের হয়। জুন-জুলাইয়ে অ্যাডমিশন টেস্ট। ১০০ নম্বরের ৬ মাসের কোর্স।

যোগাযোগ : স্কুল অব্ উইমেন স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ইউ জি আর্টস বিল্ডিং। ফোন : ২৪১৪-৬৫৩১/৬০১৪/মূলত গণমাধ্যমগুলিতে প্রচুর কাজের সুযোগ রয়েছে।

— নীল উপাধ্যায়

জীবনে বিজ্ঞান

।। নির্মল কর।।

ফুসফুসের ক্যান্সারে সবুজ চা

ধূমপানে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা খুবই। সেই ঝুঁকি কিছুটা হলেও কমাতে সাহায্য করে সবুজ চা। তাইওয়ানের চুংশান মেডিকেল ইউনিভার্সিটির সমীক্ষায় ধরা পড়েছে সবুজ চায়ের অ্যান্টিঅক্সিড্যান্ট মানুষের শরীরে টিউমার সৃষ্টি আটকাতে সাহায্য করে। সমীক্ষা বলছে, যে-ধূমপায়ী নিয়মিত সবুজ চা পান করেন তাঁর ক্যান্সারের সম্ভাবনা কম।

ঝড়ে বাজ-এ মোবাইলে সাবধান

অস্ট্রেলিয়ান লাইটনিং প্রোটেক্‌শন স্ট্যান্ডার্ড ঝড় বৃষ্টি বা বাজ পড়লে ফোন, কর্ডলেস ফোনের মতো ধাতব জিনিস ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। বিশেষ করে মোবাইল ফোন। কারণ, মোবাইল হচ্ছে অত্যন্ত সুকৌশলে তৈরি উন্নতমানের এক বেতারযন্ত্র। বাজ পড়ার সময় এর থেকে রেডিয়েশন বা বিকিরণ ঘটে মাথা ও কানের অত্যন্ত ক্ষতি করে, এমনকী বাজ মোবাইল টেনে এনে মৃত্যুও ঘটিয়েছে। উপরন্তু, বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহারে অনিদ্রা, থাইরয়েড, হার্টের অসুখ এমনকী ক্যান্সারও হতে পারে।

শতায়ু জিন

বাস্তব হতে পারে শতায়ুর বাসনা। লন্ডনের 'অ্যালবার্ট আইনস্টাইন কলেজ অব্ মেডিসিন'এর বিজ্ঞানীরা আয়ু বাড়ানোর গবেষণায় দেখেছেন, আমেরিকার আশকেলজি ইহুদি সম্প্রদায়ের মানুষের গড় আয়ু ৯৭। জানা গেছে, এর মূলে আছে জিনের বৈশিষ্ট্য। ওই সম্প্রদায়ের শিশুদের শরীরে টেলোমেরেজ এনজাইমের মাত্রাধিক্য ডি এন এ-র ভাঙন আটকাতে সাহায্য করে। টেলোমেরেজ বাড়িয়ে কোষ ধ্বংস আটকেই আয়ুবৃদ্ধি করতে চাইছেন বিজ্ঞানীরা।

জীবাণুর ছাপ

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অপরাধী ধরার কাজ আরও সহজ হচ্ছে। কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক 'জার্ম প্রিন্ট'-এর হদিশ দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, প্রতিটি ব্যক্তিই তাঁর শরীরে অসংখ্য জীবাণুর ছাপ রেখে যান। সেটা সবার ক্ষেত্রেই আলাদা ও দীর্ঘস্থায়ী। আঙুলের ছাপের মতোই এই জীবাণুর ছাপ দেখেও মানুষকে সনাক্ত করা সম্ভব। জীবাণুর ছাপ বা জার্ম-প্রিন্ট ধরে সহজেই অপরাধীদের হদিশ পাবেন গোয়েন্দারা।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র

ডঃ প্রীতিমাধব রায়

ঋষি বলা হয়ে থাকে সত্যদ্রষ্টাদের। সত্যদ্রষ্টা হতে হলে তাঁর জীবনের একটা পরম লক্ষ্য, পরমদর্শন থাকতে হবে। যিনি কেবলমাত্র গল্প, উপন্যাস, কবিতাদি লিখে থাকেন, তাঁকে সাহিত্যিক বলা যেতে পারে কিন্তু ঋষি নয়। যেমন কবিতা বা ছড়া লিখলেই প্রাচীন সংজ্ঞা অনুসারে কবি হওয়া যায় না। যম কঠোপনিষদে নচিকেতাকে উঠতে বলছেন এবং 'কবয়োঃ' বা কবিরা কি বলেছেন, তাও বলেছেন। এখানে কবি শব্দের অর্থ জ্ঞানী।

ভারতবর্ষ ধর্মময় দেশ। ভারতের মানুষের জীবনের পরম লক্ষ্য ধর্মলাভ। এখানকার কবি, সাহিত্যিক পরিপূর্ণতা লাভ করেন না, যদি তাঁর সত্যসন্ধানী দৃষ্টি না থাকে।

ধর্মতত্ত্ব প্রবন্ধের একাদশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন ঈশ্বরে ভক্তির কথা। তিনি লিখেছেন— অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, "এ জীবন লইয়া কি করিব?" লইয়া কি করিতে হয়? সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে...এইটুকু শিখিয়াছি যে, সকলবৃত্তির ঈশ্বরানুবর্তিতাই ভক্তি এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই। "জীবন লইয়া কি করিব" এ প্রশ্নের এই উত্তর পাইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্রের এই জীবন দর্শন জানা না থাকলে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রকৃতপক্ষে কিছুই বোঝা যাবে না। কারণ, এই হলো বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্জীবন জীবনজিজ্ঞাসা, জীবনসাধনা, জীবনোপলব্ধি। বঙ্কিমচন্দ্র হাকিম ছিলেন, লেখক ছিলেন, এসব হলো বাহ্য জীবনের বহিরঙ্গমাত্র। ফুল যেমন বৃক্ষের শোভামাত্র;তার ফল ও বীজে পরিণত হওয়াতেই বৃক্ষের সার্থকতা ও ধারাবাহিকতা। রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের জীবনচরিতেও আমরা এই জীবন দর্শন পাই, তাই তাঁরা মহান কবি।

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত কবি জীবনের আরম্ভ 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' কবিতা থেকে। তারপর তাঁর জীবনে এসেছে সৌন্দর্যময়, প্রেমময়, ঈশ্বরময় নানা পর্যায়, কিন্তু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে, মাত্র দিনসাতেক আগে তিনি জীবন জিজ্ঞাসা উত্তর খুঁজেছেন এবং লিখেছেন "পেল না উত্তর"। কাজী নজরুল ইসলাম প্রথম জীবনে লেটোগানের কবি, তারুণ্যে বিদ্রোহী কবি, কিন্তু, পরিণত বয়সে পরম সাধকের মতো রচনা করেছেন অতি উচ্চভাব ও মাধুর্যময় শ্যামাসঙ্গীত, রাধাকৃষ্ণের পরম প্রেমের গান। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের পরিণতি ধর্ম ও দর্শনসাধনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে।

১২৪৫ বাংলা সনের ১৩ আষাঢ় গঙ্গাতীরের কাঁঠালপাড়া নৈহাটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁর পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। প্রথমে কাঁঠালপাড়ার রামজয় সরকারের পাঠশালায়, তারপর পিতার চাকুরীস্থল মেদিনীপুরের ইংরাজী স্কুলে, তারপর হুগলী মহসীন কলেজে তার বিদ্যাচর্চা হয়। কিছুদিন প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়া, তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ছাত্রদলের মধ্যে বি.এ. পাশ। বাঙ্গলার লাঠসাহেব হ্যালিডে তাঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী দেন। চাকুরীজীবনে যশোহর, কাঁথি, জাহানাবাদ (বর্তমান আরামবাগ), খুলনা, বারুইপুর প্রভৃতিস্থানে তাঁর কার্যস্থল হয়। কাঁথির অন্তর্গত রসুলপুরের নদীর সন্নিহিতস্থল তাঁর কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের ঘটনাস্থল। জাহানাবাদের পটভূমিকায় লিখিত হয় তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। তাঁর রচনার মধ্যে দুর্গেশনন্দিনী, উপন্যাস হিসাবে বাঙলা সাহিত্যে আলোড়নের সৃষ্টি করে। কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, সীতারাম, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, ইন্দিরা, রাজসিংহ, নানা বিচিত্র বিষয়ে রচিত। অনেকের মতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। সীতারাম, আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রভৃতি উপন্যাস বিশেষভাবে স্বদেশী চিন্তাধারার প্রকাশ। আমাদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীত 'বন্দেমাতরম' আনন্দমঠ উপন্যাসের অন্তর্গত। বৃটিশ সরকারের অধীনে দীর্ঘদিন চাকুরী করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। তার অসংখ্য রচনায় বিদেশী সরকার ও শাসনব্যবস্থার তীব্র অথচ রসময় সমালোচনা আছে, যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ 'কমলাকান্তের দপ্তর'। বাঙালী হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ ও উচ্চশ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। তাঁর জ্ঞান সঞ্চ য় ও বিস্তার বহুমুখী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন পরম ধর্মপ্রাণ। কুলদেবতা রাধাবল্লভের প্রভাব বঙ্কিমজীবনে অব্যাহত ও অতলস্পর্শী। তিনি একাধারে যুক্তিবাদী ও ভক্তিময়।

তার রচনায় সমাজ সচেতনতা ও স্ত্রীচরিত্রের উৎকর্ষ লক্ষ্যণীয়। তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী রাজলক্ষ্মীদেবী মহীয়সী মহিলা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, চাকরি আমার জীবনের অভিশাপ আর স্ত্রীই আমার জীবনের কল্যাণস্বরূপা। বঙ্গীয় রমণীর কাছে তাঁর অনেক আশা। কাজেই একদিকে যেমন মহীয়সী স্ত্রীলোককে তিনি তাঁর রচনায় প্রভূত সম্মান করেছেন, পথভ্রষ্টা ও অহিতকারিণী কুন্দনন্দিনী বা রোহিণীর পরিণতি তাঁর লেখায় ক্ষমা পায়নি।

তাঁর সাহিত্য জীবনে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশপূর্বকে হল পূর্বাভাস, দুর্গেশনন্দিনী থেকে 'প্রচার' এর বিলুপ্তি পর্যন্ত মধ্যাহ্নকালে এর 'প্রচার' এর বিলোপ থেকে বঙ্কিমের মৃত্যু পর্যন্ত অন্তকাল। এই অন্তকালে 'সাহিত্যকর্ম' মূলতঃ ধর্মপ্রচারে পরিণত, কিন্তু মোটেই গৌরববর্জিত নয়। এই কালের রচনা—কৃষ্ণচরিত ও ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থদ্বয় বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্মানসের প্রকাশ।

রামমোহনের পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভারতের আধ্যাত্মবাদের সংমিশ্রণচিন্তা ও প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। বঙ্গসাহিত্য কেবল গল্প, উপন্যাস, কবিতাতেই সমৃদ্ধ ও পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না, বঙ্কিমচন্দ্র তা অনুধাবন করেছিলেন। এই সমৃদ্ধি র ভাবনাকে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি বঙ্গদর্শন পত্রিকাটির সাহায্য নিয়েছিলেন। ওই পত্রিকাটিকে ঘিরে একটি লেখক গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। কিন্তু, পত্রিকাটি বেশিদিন চলেনি। ১৮৮৪ সালে তিনি 'নবজীবন' ও 'প্রচার' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন, যার মাধ্যমে তিনি ধর্ম ও দর্শন চর্চায় প্রবৃত্ত হলেন। বঙ্গদেশে বঙ্গদর্শন গোষ্ঠীর ভূমিকা অনেকটা ফরাসী দেশের 'এনসাইক্লোপিডিস্ট'দের সঙ্গে তুলনীয়। শিল্পসাহিত্য, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা সবকিছুই তার অন্তর্গত।

রাষ্ট্রচিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র রাজনীতিকে ধর্মের একটি অঙ্গরূপে দেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমকে যথোচিত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি রাষ্ট্র দর্শনকে নীতিশাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মেকিয়াভেলির মতে রাষ্ট্রস্বার্থে ধর্ম ও নীতিকে উপেক্ষা করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি লিখেছেন, "সর্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই, আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া-এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।" ভারত তাঁর কাছে একটি ভূখণ্ড মাত্র ছিল না। ভারত তাঁর কাছে জননী। এই জননীর দুঃখে তিনি দুঃখিত, এই জননীকে গৌরবশালিনী করাই তার জীবনের আদর্শ। মা কি ছিলেন, কি হইয়াছেন, কি হইবেন সেই চিত্র তিনি আনন্দমঠে অঙ্কিত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সময় ও সমাজকে সামনে রেখে নতুন সমাজবোধ ও জীবনাচার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তিনি মননশীল দৃষ্টিতে ধর্মের বিচার-বিশ্লেষণ করেন। তিনি লিখেছেন, "কেবল হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ ধর্ম। অন্য জাতির বিশ্বাস যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়াই ধর্ম। হিন্দুর কাছে ইহকাল, পরকাল, ঈশ্বর, মনুষ্য, সমস্তজীব, সমস্ত জগৎ-সকল লইয়াই ধর্ম। এমন সর্বব্যাপী, সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কি আর আছে? (ধর্মতত্ত্ব)।" এই বিশ্বাসের পিছনে ছিল তাঁর অনুশীলন তত্ত্ব, যার মূল কথা হলো ঈশ্বরভক্তি। আবার সর্বভূত ত্রিকাল ধর্মের অঙ্গরূপ ও অনুশীলন তত্ত্বের অংশ। ধর্মতত্ত্বে লিখিত আছে, "প্রাচীন ঋষি এবং পণ্ডিতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহাজ্ঞানী। তাহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে কদাপি অনাদর করিবে না... আমিও সেই অর্থে ঋষিদিগের পদারবিন্দ ধ্যানপূর্বক, তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত পথেই যাইতেছি।' শ্রীমদ্ভাগবদগীতার মূল বক্তব্য যে ভাগবত উক্তির উপর রচিত সে বিষয়ে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি বলেছেন যে পশ্চি মী অনুশীলনধর্মের লক্ষ্য নিছক সুখমাত্র। কিন্তু তাঁর অনুশীলন-তত্ত্বে তিনি ভারতীয় ভারধারাকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন এবং সেটা তাঁর মতে হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে— এবং তারই উপর ভগবদগীতা প্রতিষ্ঠিত; তার এই অনুশীলন তত্ত্বের লক্ষ্য মুক্তি। এই মুক্তি লক্ষেই পরবর্তীকালে এক বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু, তাঁর অর্থ এই নয় যে বঙ্কিমচন্দ্র বৃটিশের অপসারণের জন্য সশস্ত্র বিপ্লব করা সমর্থন করতেন। অবশ্য, তার আনন্দমঠে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ও দেবী চৌধুরাণীতে স্বদেশপ্রেমিক আদর্শবাদী দস্যুদের কথা আছে, কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ লোকপ্রেম ও ভক্তির আদর্শেপূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্র এক নতুন জীবনাচারের চিত্র অঙ্কন করেছেন। পরমাত্মাকে উপলব্ধি করতে হলে চাই সর্বলোক ও আত্মার অভিন্নতাবোধ—একমাত্র সেই চেতনাতেই জ্ঞান, কর্ম ও ধর্মাচরণ নির্ভরশীল। সেই জ্ঞান থেকেই আসে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সুখ ও শান্তি। হিন্দুধর্মের মধ্যেই তিনি সেই চেতনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন।

অনেক তথাকথিত প্রগতিশীল ব্যক্তি বলেছেন যে, বঙ্কিমের ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বিত চিন্তা ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার পথে নিয়ে যায়। এই বক্তব্য ভুল এবং হয়ত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। দেশকে মাতৃভাবে চিন্তা কেবল হিন্দু ব্রাহ্মণ বঙ্কিমচন্দ্র করেননি, মুসলমান কাজী নজরুল ইসলামও করেছেন। কারণ, হিন্দুধর্মের মাতৃপূজার থেকে দেশজননীর উন্নততর সংজ্ঞা পৃথিবীর, আর কোনও ধর্মে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণ নয়, তা দেশ, কাল ও শূন্যতা প্রভৃতির উর্ধ্বে চিরন্তন পরমতত্ত্ব যা পরমেশ্বরের ইচ্ছায় চলে, মানুষ যেখানে ক্রীড়নকমাত্র।

আর বঙ্কিমচন্দ্র কোনও ভাবেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তিনি দেশের শ্রীবৃদ্ধি কে ব্যঙ্গ করেছেন, কারণ, ওই শ্রীবৃদ্ধি তে যে "হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া চষিতেছে, তাদের কোনও শ্রীবৃদ্ধি হয়নি। তিনি রামা কৈবর্তের আগে হাসিম শেখের নাম করেছেন, তাদের দুঃখে তিনি একই ভাবে ব্যথিত। হাসিম শেখ ও রামা কৈবর্ত তাঁর কাছে একই ভাবে নিপীড়িত মানুষ, সেখানে কোনও সম্প্রদায়গত বিভেদ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি গ্রন্থে আওরঙ্গজেব ও যবনদের চেয়ে তাঁদের বিপরীত পক্ষ হিন্দুদের মহত্তর রূপে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু, তার কারণ হিন্দু প্রীতি ও মুসলমান বিদ্বেষ নয়, সেখানে আওরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংসকারী, রাজপুত রমণীর প্রতি লালসাযুক্ত, যেখানে যবনেরা বাঙালী স্বাধীন হিন্দুরাজা সীতারামের রাজ্য ধ্বংসকার্যে আগ্রহী সেখানে আক্রমণকারী মুসলমানের বিরোধী বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু দরিদ্র মুসলমানের প্রতি সহানুভূতিশীল।

বঙ্কিম মুসলমান বিরোধী নন, অন্যায়ের বিরোধী হিন্দু জমিদার মুসলমান হাসিম শেখ নামক গরীব চাষীর উপর অত্যাচার করলে তিনি হাসিম শেখের পক্ষে জমিদারের বিরোধী।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের "প্রগতিশীল" ইতিহাস-পণ্ডিতেরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন, সাহিত্য ও দর্শনের বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। দেশপ্রেমী, মানবপ্রেমী ঈশ্বরপ্রেমী এই ঋষিকে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িক রূপে চিত্রিত করতে চেয়েছেন, এবং অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু এখন আর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যের প্রতি অনাগ্রহী হয়ে সাহিত্যিক আবর্জনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিরাট বঙ্কিম সাহিত্যের পুনঃ পাঠন ও মননের প্রয়োজন, যা সমগ্র হিন্দু সমাজকে সঞ্জীবিত করবে।

বঙ্কিম সাহিত্যকে গভীরভাবে পাঠ করলে দেখা যাবে যে, একদিন ভাষার অসাধারণ ঐশ্বর্য ও রসময় রচনা শৈলীতে তিনি বাংলা ভাষার কথাশিল্পকে নবরূপ দিয়েছেন। প্রবন্ধ ও পত্রিকায় বাংলা ভাষার নানা বিষয়ের সন্নিবেশ করেছেন, সমৃদ্ধ করেছেন ভাষাকে। কঠোর সমালোচনা করেছেন অন্যায়কারীর, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছেন মানুষকে, ঈশ্বরভক্তির পরম প্রকাশে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আধ্যাত্মিকতাকে, যা হিন্দুত্ব ও মনুষ্যত্বের একমাত্র ভিত্তি।

শতবর্ষে গঙ্গাপ্রসাদ বসু

বিকাশ ভট্টাচার্য

আমার বয়স তখন ১৭। ১৯৫৯ সালে কলেজ স্ট্রীটের মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পিতৃদেবের সুবাদে পাওয়া গেস্ট কার্ড নিয়ে প্রায় রোজই সন্ধ্যায় যাচ্ছি। সেখানেই আমার প্রথম বহুরূপীর নাটক দেখা। নাটকের নাম রক্তকরবী। অভিনেতা নির্দেশক শম্ভু মিত্র ছাড়া এই নাটকের আর যাঁকে চিনতাম তিনি তৃপ্তি মিত্র। বাকিদের কাউকেই চিনি না। কিন্তু সেদিনের পর একজনকে আলাদাভাবে মনে রেখেছিলাম। উথাল পাথাল নন্দিনীর মুখোমুখি আত্মমগ্ন নিষ্কম্প এক অধ্যাপক। অভিনয় করেছিলেন গঙ্গাপদ বসু। পরে যাঁর অভিনয়ের আমি ভক্ত হয়ে গেলাম। শুধু আমি কেন এমন কোনও বাঙ্গালি আছেন কি যিনি এই শিল্পীর নাটক বা চলচ্চিত্রের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হননি? বা আজও হন না।

গত ১২ মার্চ (জন্ম ১৯১০ সালের ১২ মার্চ যশোহর জেলার খাসিয়াল গ্রামে) এই মহান শিল্পীর জন্মশতবর্ষ পেরিয়ে গেল। না সরকার পক্ষ থেকে, না তাঁর প্রতিষ্ঠিত নাট্যদল বহুরূপী থেকে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনও অনুষ্ঠান বা উৎসব হ'লো। এ প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের এই শিল্পীর সম্বন্ধে বহু পূর্বের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। "...আজকের যুগটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমনই এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, মৃত্যুর পর কারোর সম্বন্ধে কিছু করতে হলে তাকে পাবলিসিটি করে, নিজের শোকসভার বা স্মারক গ্রন্থের যোগাড়যন্তর করে তবে তাকে মরতে হবে।'

আজন্ম দেশপ্রেমী

ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী বিনয় বসুর নেতৃত্বে নড়াইল শহরে তিনি বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। নড়াইল কলেজে তাঁরই উদ্যোগে নড়াইল পলিটিক্যাল কনফারেন্স হয়, সেখানে সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র বসু। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বারীন ঘোষ প্রমুখ। এই সময়েই গঙ্গাপদ সূর্য সেন, সতীশ পাকড়াশী, দীনেশ মজুমদার প্রমুখ বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। এই রাজনৈতিক ধারাবাহিকতাতেই তাঁর কলকাতায় আসা এবং সাংবাদিকতায় যোগ দেওয়া। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, তিনি ১৯৪২ সালে ভূমিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামকরণ করেন স্বদেশ এবং ১৯৪৬ সালে ভূমিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্রের নামকরণ করেন স্বরাজ।

নাট্যজীবন

গণনাট্য সঙ্ঘের 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটকে তাঁর অনবদ্য অভিনয় তাকে একজন প্রথম শ্রেণীর অভিনেতারূপে প্রতিষ্ঠা দেয়। এরপর বিজন ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, ঋত্বিক ঘটকের সঙ্গে তিনিও গণনাট্য সঙ্ঘ ছাড়লেন। ১৯৪৮ থেকে আমৃত্যু অর্থাৎ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বহুরূপীতে তাঁর অভিনীত নাটকগুলি হলো (ব্রাকেটে তাঁর অভিনীত চরিত্রের নাম) পথিক (নিকুঞ্জ গড়াই), উলুখাগড়া (পাঁচু বাড়ুজ্জে), ছেঁড়াতার (হাকিমুদ্দি), দশচক্র (রাধানাথ), চার অধ্যায় (ইন্দ্রনাথ), রক্তকরবী (অধ্যাপক), মুক্তধারা (রাজা রণজিৎ), কাঞ্চ নরঙ্গ (কর্তা), রাজা অয়দিপাউস (মেষপালক), ডাকঘর (মাধব দত্ত), কিম্বদন্তী (শিরোমণি) এবং আরও অজস্র নাটক। এরমধ্যে একেবারে প্রথমদিকের কয়েকটি ছাড়া তাঁর সবকটি নাটকের মঞ্চ াভিনয় আমি দেখেছি। নাটক যতটুকু বুঝি তাতে আমার মনে হয়েছে, তাঁর অভিনয়ে অভিনেতা লুপ্ত হয়ে যায় চরিত্রের মধ্যে। অতি পরিশীলিত ও দীর্ঘ মহালালব্ধ কলাকৌশলের পরিবর্তে তাঁর অভিনয়ে সৃষ্টি হয় এক স্বতস্ফূর্ততার পরিবেশ। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে অংশীদার, সত্য মারা গেছে, জীবনায়ন, অন্ধকারের বৃত্ত, নমোযন্ত্র, প্রজাপতয়ে নমঃ, ইদানিং, বিশ্বাসের মৃত্যু, একটি স্বপ্নের জন্য—বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চলচ্চিত্রাভিনয়

প্রায় চল্লিশ বছর আগে গত শিল্পীর মঞ্চ াভিনয় আজকের প্রজন্মের অনেকেরই দেখা না থাকতে পারে। কিন্তু টি.ভি-র কল্যাণে জলসাঘর, পরশপাথর ইত্যাদি বহু ছবিই তো এখন দেখা যায়। জলসাঘরের মহিম গাঙ্গুলি বা পরশ পাথরের কৃপারাম কাচালুর স্টাইলাইজড অসামান্য অভিনয় কে না দেখেছেন? অস্তগামী জমিদার বিশ্বম্ভর রায় বনাম উঠতি ব্যবসায়ী মহিম গাঙ্গুলির টক্কর বা পরশপাথরে তুলসী চক্রবর্তীর সঙ্গে সমান তালে কমিক অভিনয় কি ভোলা যায়? ১৯৭১-এর ২২ মে মাত্র ৬১ বছর বয়সে গঙ্গাপদ বসুর প্রয়াণের পর উত্তম কুমার এক স্মৃতিচারণায় লিখেছিলেন, —"পর পর কত ছবিতেই তো আমরা পরস্পর সামগ্রিক শিল্পসৃষ্টিতে অংশীদার হয়েছি। সূর্যতোরণ, কুহক, নিশীথে, ইন্দ্রাণী, শুন বরনারী, বিভাস, সূর্যশিখা, শুধু একটি বছর, অবাক পৃথিবী, নিশিপদ্ম, এখানে পিঞ্জর—আরও কত ছবি। মনে পড়ে যায়, অভিনয় চলাকালীন ছোটবড় সেইসব অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলো—যে উপলব্ধির রাজ্যে ছিলাম শুধু আমরা দুজন। তোমার চোখের সেই অর্থবহ ইঙ্গিতে, আমার সংলাপ-নিক্ষেপের বিশেষ প্রত্যাশাগুলোর মুহূর্তে তুমি যেখানে ছিলে আমার শিল্প-সৃষ্টির পরিপূরক। আরও মনে পড়ে তোমার মধুর ব্যক্তি সান্নিধ্যের উত্তাপ। স্পর্শকাতর মনে তোমার ভালোবাসার ছোঁয়া। হৃদয় দিয়ে হৃদয় হরণ করবার এক অদ্ভুত জাদুকর তুমি। তোমাকে ভুলব না।"

জন্মশতবর্ষে এই মহান শিল্পী, দেশপ্রেমী ও আপাদমস্তক এক সুভদ্রজনকে জানাই সশ্রদ্ধ প্রণাম।

শব্দরূপ - ৫৫৩

অয়ন পাল

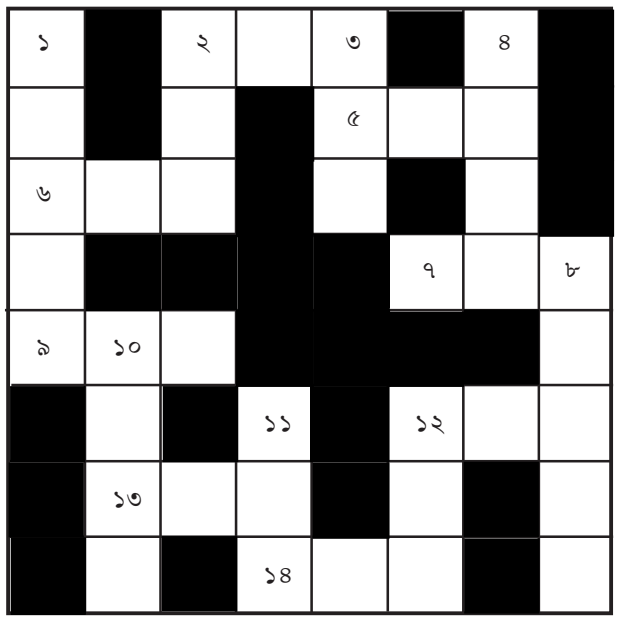

সূত্র ঃ

পাশাপাশি ঃ ২. ব্রহ্মার মানসপুত্র সৃষ্টিকর্তা মুনি বিশেষ, ৫. বিশেষণে দানের যোগ্য, দেয় বস্তু, ৬. এই মহর্ষি ব্যাসদেবের আদেশে বনবাসী পাণ্ডবদের সঙ্গে থেকে তাঁদের বহু তীর্থ দর্শন করান, প্রথম দুয়ে পশম, ৭. তৎসম শব্দে হোম, আহুতি, শেষ দুয়েজঙ্গল, ৯. মাদ্রীর পুত্র, আগাগোড়া পাইপ, ১২. বিশেষণে সুমিষ্ট, মাধুর্যযুক্ত, ১৩. ডাকনামে চাঁদসদাগরের পুত্র, ১৪. দেবতা, ঈশ্বর।

উপর-নীচ ঃ ১. দানবরাজ শুম্ভের সেনাপতি, শেষ তিনে তৎসম নয়ন, প্রথম দুয়ে ধোঁয়া রঙের, ২. অন্যনামে শিব, ৩. চৈতন্যরূপ আত্মা, জ্ঞানময় ব্রহ্ম, ৪. প্রথম মনু, এর স্ত্রী শতরূপা ও পুত্র উত্তানপাদ, ৮. স্থানিক পরিচয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের এক নাম, ১০. তৎসম শব্দে নীলপদ্ম, মধ্যে শক্তি, ১১. নৌকার ছোটো দাঁড়বিশেষ, ১২. গঙ্গাদেবীর বাহন।

সমাধান শব্দরূপ ৫৫১

সঠিক উত্তরদাতা

শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯।
লক্ষণ বিষ্ণু
সিউড়ি, বীরভূম।

■	■	ফ	ণি	ভু	ক	■	বি
বি	ম	লা	■	■	ং	■	ণ
■	ঈ	■	অ	■	স	ত	তা
■	ল	ব	ঙ্গ	■	■	র	■
■	চ	■	■	মা	ত	ঙ্গ	■
গা	ণ্ডী	ব	■	দ্রী	■	মা	■
ন্ধা	■	ন্দ	■	■	আ	লা	বু
রী	■	না	গ	রা	জ	■	■

● **৫৫৩ সংখ্যার সমাধান আগামী ১২ জুলাই, ২০১০ সংখ্যায়**

ভাষণ দিচ্ছেন সত্যনারায়ণ মজুমদার, বসে অতুল কুমার বিশ্বাস ও নগেন্দ্রনাথ গুছাইত।

মায়াপুরে সঙ্ঘের দ্বিতীয় বর্ষ বর্গের সমাপ্তি উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি।। "এদেশের জাতিগত (Nation) পরিচয় হিন্দু। সেজন্য চীনে সুব্রামনিয়াম স্বামীকে জাতিতে হিন্দু, ধর্মে শৈব বলা হয়েছিল। এদেশের মুসলমানরা হজ করতে গেলে তাদেরকে হিন্দ্সা মুসলমান বলা হয়। এদেশের উন্নতির জন্য মূল জাতীয় সমাজকে সংগঠিত করাটাও জরুরী। সেজন্যই গত ৮৫ বছর যাবৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ দেশের হিন্দু সমাজকে সংগঠিত করার কাজ করে আসছে। একাজ কোনও সম্প্রদায় বিশেষের বিরোধী নয়।" উপরের কথাগুলি বলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পূর্বক্ষেত্রের কার্যবাহ সত্যনারায়ণ মজুমদার। গত ১৭ জুন বিকেলে শ্রীধাম মায়াপুরে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের পশ্চিমবঙ্গের (দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ) দ্বিতীয় বর্ষ সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গের প্রকাশ্য সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে তিনি বক্তব্য রাখছিলেন। শ্রী মজুমদার আরও বলেন, হিন্দুত্বের বৈশিষ্ট্যই হলো বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং আত্মার অনুসন্ধান। মনুষ্যত্ব থেকে দেবত্বে উন্নয়ন। সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। এদেশের মুসলমান ও খৃস্টানরা এই চিন্তাধারাকে মেনে নেয়নি। তারা সবাইকে একছাঁচে ঢালতে চায়। যা এদেশের প্রকৃতি বিরুদ্ধ। গুরু নানক ইসলামের আক্রমণকে বলেছেন —'হিন্দুস্থান খসমানা কিয়া'। পাকপন্থী জেহাদ ও খৃস্টান ও মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির চক্রান্তকে তীব্র সমালোচনা করেন শ্রী মজুমদার। বহুজাতিক কোম্পানীর এদেশে মুনাফা লোটা এবং ভোগবাদী সাংস্কৃতিক আক্রমণেরও তিনি কড়া সমালোচনা করেন। এছাড়া যাঁরা হিন্দু আচরণ করেন অথচ মুসলিম তোষণের জন্য নিজেদেরকে হিন্দু বলেন না, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধরে রাখার জন্য নিজেদের সংখ্যালঘু বলে হলফনামা দেন— সে বিষয়ে তীব্র বিরোধিতা করেন শ্রীমজুমদার। রাজনৈতিক লাভের জন্য জাত-পাত-ভিত্তিক রাজনীতি এবং ধর্মভিত্তিক সংরক্ষণেরও কড়া সমালোচনা করেন শ্রীমজুমদার। পরিশেষে তিনি সবাইকে সঙ্ঘের কাছে এসে হিন্দুত্বের কাজে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানান। এদিন বর্গের প্রতিবেদন পেশ করেন বর্গের সর্বাধিকারী নগেন্দ্রনাথ গুছাইত। শিক্ষার্থী স্বয়ংসেবকরা ব্যায়ামযোগ, সূর্যনমস্কার, যোগাসন, নিযুদ্ধ (ক্যারাটে), দণ্ডযুদ্ধ (লাঠিখেলা) প্রভৃতি প্রদর্শন করেন। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বর্গের সর্বব্যবস্থা প্রমুখ গৌতম পাল। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সঙ্ঘচালক অতুল কুমার বিশ্বাস। শ্রীচৈতন্যদেবের স্মৃতি বিজড়িত শ্রীধাম মায়াপুরের বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। নবদ্বীপ শহর এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রাম থেকেও সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক ও শুভানুধ্যায়ীরাও এসেছিলেন। ১৮ জুন রাত্রিতে বর্গে উপস্থিত প্রায় একশত কার্যকর্তাকে যোগপীঠ মঠের কর্তৃপক্ষ রাত্রিতে ভরপেট প্রসাদ খাইয়ে আপ্যায়িত করেন। এই বর্গে মঠের সঙ্গে সঙ্ঘের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ ও সুদৃঢ় হলো বলাই যায়।

রজত জয়ন্তী বর্ষে 'কলামন্দির'

সংবাদদাতা।। উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ছোটদের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান 'কলামন্দির' এ বছরে পায়ে পায়ে পঁচিশে পড়ল। সেই উপলক্ষে গত ৫ জুন '১০, কলকাতায় গিরিশ মঞ্চে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল বিখ্যাত ভারতনাট্যম্ শিল্পী থাঙ্কমণি কুট্টির। কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় উপস্থিত হতে পারেননি। মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন প্রয়াত সাহিত্যিক-সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষের সহধর্মিণী সমাজ সেবিকা শীলা ঘোষ, সমাজসেবক ডি আশিস, সাংবাদিক সম্পাদক মায়া সিদ্ধান্ত, প্রাক্তন বিধায়ক সলিল চট্টোপাধ্যায়। ছোটদের গান-নাচ-আবৃত্তির পাশাপাশি ছিল গান ও নাচের ছাত্র-ছাত্রী সম্মিলিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তাসের দেশ'। নাচে-গানে ভরে ছিল প্রেক্ষাগৃহ। রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষে এই উপস্থাপনা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয় সম্মিলিত শাস্ত্রীয় নৃত্যের মাধ্যমে। এছাড়া আমন্ত্রণমূলক নাটক ছিল অনীক-এর সরীসৃপ, বিধায়ক ভট্টাচার্যের রচনা।

তেত্রিশ বছরের উদ্ধত সরকারের বিরুদ্ধে নেমে আসছে গণরোষ

(৫ পাতার পর)

প্রাদুর্ভাব হল। ম্যালেরিয়াতে মৃত্যু ঘটলো এক সময়ের ডেপুটি মেয়র নীলরতন সিং-এর ও গায়ক-অভিনেতা সবিতাব্রত দত্তের। এমনকি সরকারি হাসপাতালে ঘুষের রাজত্ব তৈরি হল। 'জাল কিটের' তদন্ত ধামাচাপা পড়লো। এখনতো সরকারি হাসপাতালের রক্তে হেপাটাইটিস-সি-এর জীবাণু দেখা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তর সম্পর্কে জ্যোতি বসু এবং বুদ্ধদেববাবু খোলাখুলি সমালোচনা করেছেন কিন্তু দাম্ভিক ডাঃ সূর্য মিশ্র অটল। শোনা যায় তাঁর স্ত্রীর একটি এন জি ও আছে। তারা নাকি কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য পায়?

৩২ বছরে সিপিএম কোটি টাকার ব্যবস্থা করেছে—পার্টি নেতা-মন্ত্রীদের বিত্তবান করে তুলেছে। কর্পোরেট হাউসের মতো পার্টি অফিস গড়ে তুলেছে। মনে হয় কোনো একটি শিল্প সংস্থা জাল বিস্তার করেছে। শুধু সিপিএম নয়, আর এস পি-এর রাজ্যদপ্তর মৌলালী-ধর্মতলার মুখে কি করে কেনা হল, যেখানে পার্টির শক্তি ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়েছে।— প্রশ্ন ওঠে রিপন স্ট্রিটের ক্রান্তি প্রেসের বাড়ি কেনা হল কত টাকায় ও কিভাবে? ফরওয়ার্ড ব্লকের বহুবাজারের প্রাসাদোপম বাড়ির— যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। কিভাবে ফরওয়ার্ড ব্লক কিনলেন? সিপিআই ও তাদের বাড়িটি কত টাকায় সরকারের কাছ থেকে কিনেছেন? কোন শিল্পপতি 'ভূপেশ ভবন' গড়ে ছিলেন?

আজ বামফ্রন্টের প্রতিটি পার্টি এবং তাদের নেতারা দুর্নীতিগ্রস্ত। দুর্নীতির শুরু জ্যোতি বসুর আমলেই। জনগণ ভুলে যাননি আলিপুর ট্রেজারি কেলেঙ্কারি, সল্টলেক রিক্ল্যামেশন কেলেঙ্কারী। এরপর সিপিএম পার্টিটা প্রমোটারদের পৃষ্ঠপোষক পার্টিতে পরিণত হল। তাইতো প্রয়াত মন্ত্রী বিনয় চৌধুরী বলেছিলেন 'ফর দি প্রমোটার অফ্ দি প্রমোটার বাই দ্য প্রমোটার'— এই সরকার। জ্যোতিবাবু তাঁর উত্তরে প্রকাশ্যে বলেছিলেন বিনয়বাবু মন্ত্রিসভা থেকে চলে গেলেই।... বিনয়বাবু চলে গেছলেন কিন্তু বুদ্ধবাবু কূটকৌশল করে ইয়েচুরি কারাতদের ধরে করে মন্ত্রিসভার দফতরে ফিরে এসেছিলেন। তাইতো আজ সিপিএম তথা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে মানুষের ঘৃণা, রোষ ও ক্রোধ ভোটের বোতামে প্রতিফলিত হচ্ছে। ৩২ বছরে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকারের কীর্তিকলাপ যেন পদ্মবনে মত্ত হস্তির তাণ্ডব, বস্তুত এর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে বামপন্থীদের শশ্মান যাত্রা করিয়ে ছেড়েছে। আজ সারাদেশে কংগ্রেসের বিকল্প সিপিএম নয়, ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে বিজেপি।

জার্মান কমিউনিস্ট পার্টিতে আর্ল-বাউডার পার্টিকে লিকুউডেশনে দিতে চেয়েছিলেন। আজ পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম-এ আর্ল বাউডার কে? বুদ্ধ-বিমান-বিনয়-নিরূপম-শ্যামল— এঁরা কি? আবার কে? আগামী দিনে জার্মান নেতা হোনেকারের মতো অবস্থা কি সিপিএম নেতাদেরও হবে? হতে বাধ্য, কারণ সিপিআই নেতা গুরুদাশবাবু বলেছেন 'দোষের জন্য প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। প্রকাশ্য বিতর্ক তুলতে হবে পরাজয় সম্বন্ধে।' সিপিএম জনগণের সামনে নিজেদের অন্যায়-অত্যাচার সম্পর্কে দোষ কবুল করেনি। তাই বামফ্রন্ট শেষ হচ্ছে। বিরোধী শক্তি তথা মমতা-কে সিপিএম-এর নীতিই উঠতে সাহায্য করেছে। আগামীদিনে মমতা-রাজ হওয়ার দিকেই রাজ্য এগোচ্ছে। ৩২ বছরে বামফ্রন্টের এটাই সব থেকে বড় অবদান!

ফোঁস করলেই সি বি আই

শিবাজী গুপ্ত

দেশে চলছে হারেমের শাসন— যা প্রকারান্তরে হারামির। এই হারেমের শাসনকে দীর্ঘায়িত করেছিল সিপিএম দল। ভেবেছিল এভাবেই এ সুখেই দিন যাবে। শাসকগোষ্ঠীর পাপের বোঝা বইব অথচ পাপ গায়ে লাগবে না। কিন্তু তা কি কখনও হয়? যখন পাপের বোঝা নামাতে গেল, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ততদিনে নিজেদের পায়ের তলার মাটি অনেকখানি ক্ষয়ে গেছে।

কথায় বলে গোদা পায়ে লাথি দেখাতে নেই কিংবা নড়বড়ে দাঁতে দংশিতে নেই; বিশেষত বিষদাঁত যখন আগেই খসে গেছে। সময় থাকতে সমঝে চললে সিপিএম-এর এই দুর্দশা হোত না। কংগ্রেসীদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হলে আরও আঁটোসাঁটো কোমর বেঁধে নামতে হয়। কারণ ক্ষমতা দখল, ক্ষমতা ধরে রাখতে এমন কোনও নীতিহীন রুচিহীন কাজ নেই যা এই দলটা করেনি বা করছে না। তা না হলে মুসলিম লীগের সঙ্গে ঘর করে বিজেপি-কে সাম্প্রদায়িক বলে গালি পাড়তে পারে? এ তো বাজারিয়া মেয়েদের বুক ফুলিয়ে সতীত্ব জাহির করার সামিল। সিপিএম নিজেও এই কংগ্রেসী কোরাসে গলা মিলিয়ে বিজেপিকে গালিগালাজ করে থাকে। কিন্তু স্বাধীনতার আগে কি পরে কখনও কংগ্রেসের চোরা সাম্প্রদায়িক চরিত্রের কোনও নিন্দা করেনি। আজ তারা কোনও কোনও বিষয়ে বিজেপির সঙ্গে সহমত পোষণ করে অন্তত লোকসভার ভেতরে যে কিছুটা কাছাকাছি এসেছে, তা যদি দশ বছর আগে হোত, তাহলে রাজনৈতিক গতিপথ ভিন্ন খাতে বইত।

সিপিএম সব ডিম এক বাস্কেতে রেখেছিল। হিন্দু জাতীয়তাবাদকে গালিগালাজ করে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা-বাদীদের একমাত্র রক্ষাকর্তা ভেবে মুসলীম ভোট গায়েব করার খোয়াবে মেতেছিল। আজ বাস্কশুদ্ধ সব আণ্ডা ভেঙ্গে চুরমার। মুসলিম ভোটে তা দেবার জন্য মুসলমানদের নতুন মুরগী জুটেছে; আর সিপিএমের 'হায় আল্লা, এ কি করলে' বলে কপাল চাপড়ানো ছাড়া গতি নেই।

সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং

লালু শিবু মুলায়ম মায়াবতীরা যখনই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, বা কোনও বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দানে কোমর বাঁধে, সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া-মনমোহন যুগল সিবিআই-র ঝাঁপি থেকে ফাইল বের করে তাদের সামনে নাচাতে থাকে—ঠিক যেমন সাপুড়েরা সাপ ফোঁস করে উঠলেই তার সামনে মা মনসার মন্ত্রপূত শিকড় ধরিয়ে সাপের ফোঁসফোঁসানি বন্ধ করে তাকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলে।

ধর্মনিরপেক্ষ তকমা আঁটা লালু-মুলায়ম-মায়াবতী-রামবিলাসদের সঙ্গে সিপিএমের কি মাখামাখি গলাগলি ঢলাঢলি। এই চতুষ্কদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে সিপিএম কি কম নাচানাচি করেছে। আজ সিপিএমের বিপদকালে সবাই কেমন সটকে গিয়ে কংগ্রেসের কোলে উঠেছে। বন্ধু চিনতে ভুল করলে এই দশাতেই পড়তে হয়।

যেসব দলের সঙ্গে সিপিএম দোস্তালি পাতাতে গেছে, সেসব দলের নেতা-নেত্রীর অবৈধ ক্রিয়াকলাপ ও দুর্নীতির জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত চলছে। সত্যের খাতিরে একথা স্বীকার করতেই হবে যে দেশব্যাপী এই সার্বিক দুর্নীতি ও নীতিভ্রষ্টতা থেকে বামপন্থী দলের নেতারা অনেকটা মুক্ত। তাদের কারও বিরুদ্ধে সিপিআই তদন্তের কথা শোনা যায় না।

কিন্তু সিপিএমের স্যাঙাৎ দলগুলির নেতানেত্রীদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির পাহাড় প্রমাণ তথ্যপ্রমাণ উত্থাপিত হলে এবং সিবিআই তার তদন্তে প্রবৃত্ত হলেও কখনও সেগুলির তদন্ত শেষ হয় না— মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে চাঞ্চল্যকর বিবৃতি প্রকাশ ছাড়া। লালু শিবু মুলায়ম মায়াবতীর দল যখনই কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সরকারের নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়, বা কোনও বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দানে কোমর বাঁধে, সঙ্গে সঙ্গে সোনিয়া-মনমোহন যুগল সিবিআই-র ঝাঁপি থেকে ফাইল বের করে তাদের সামনে নাচাতে থাকে—ঠিক যেমন সাপুড়েরা সাপ ফোঁস করে উঠলেই তার সামনে মা মনসার মন্ত্রপূত শিকড় ধরিয়ে সাপের ফোঁসফোঁসানি বন্ধ করে তাকে ঝাঁপিতে পুরে ফেলে।

গত চার মাসে এই খেলা দু'বার দেখা গেছে— প্রথমে অনাস্থা প্রস্তাবে ও পরে কাটমোশনের উপর ভোটাভুটিতে। বিজেপির সঙ্গে ভোট দিয়ে তারা সেকুলার-সতীত্ব হানি করতে নারাজ; তাতে যদি পুঁতিগন্ধময় কংগ্রেসী শাসন চিরস্থায়ী হয় তাতেও রাজী। পচা দুর্গন্ধময় গোবরে তারা আকণ্ঠ ডুবে থাকবে সে ভি আচ্ছা—কিন্তু পদ্মফুলে হাত দিয়ে তারা হাত অশুদ্ধ করবে না কিছুতেই। তার চেয়ে কংগ্রেসী কাটা হাতকেই তারা আঁকড়ে ধরবে— কারণ সে হাতে রয়েছে সিবিআই'র ফাইল। কানকাটালের মৃত্যুবাণ সে ফাইলের মাঝে।

অধ্যাপক ডঃ প্রণব রায় সংবর্ধিত

সংবাদদাতা।। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রাপ্ত ডি. লিট. এবং আঞ্চলিক ইতিহাসের বিশিষ্ট গবেষক ও পুরাতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ড. প্রণব রায়কে আদ্যাপীঠ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ (কলকাতা) গত ১৭ জুন (২০১০) সংবর্ধনা জানান। আদ্যা মায়ের প্রশস্ত নাটমন্দিরে উপচে পড়া ভিড়ে বিশাল মঞ্চে আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক ব্রহ্মচারী মুরালভাই ডঃ প্রণব রায়ের সাম্প্রতিক ডি. লিট. প্রাপ্তির জন্য গভীর আনন্দ প্রকাশ করেন। মায়ের প্রসাদী মালা পরিয়ে ডঃ রায়কে বরণ করে নেওয়া হয়। মঞ্চে প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্যামল কুমার সেন, কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তপন কুমার মুখোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বর্তমান সচিব স্বপন সরকারকেও মাল্য ও বস্ত্র দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই মানপত্রটি পাঠ করে বলেন, অধ্যাপক ডঃ রায় একজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট গবেষক। মহাবিদ্যালয়ে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করে এবং 'সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদে'র সচিব থাকাকালীন শিক্ষা প্রসারে নিঃস্বার্থ ভূমিকা নিয়েছেন। তাঁকে আজ শ্রীমা মণিকুন্তলা দেবীর (শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের সুযোগ্যা সহধর্মিণী) শুভ জন্মতিথি অনুষ্ঠানে সম্মান জানাতে পেরে আমরা কৃতার্থ। এইদিন মায়ের ১১১ তম জন্মতিথি উপলক্ষে বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

এই সঙ্গে বিখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত দর্শনশাস্ত্রবিদ্ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ বছর ডি. লিট. (সাম্মানিক) উপাধিপ্রাপ্ত দীননাথ ত্রিপাঠীকেও (আশ্রমিক নাম দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম) ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই আন্তরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

সংবর্ধনার প্রত্যুত্তরে অধ্যাপক রায় সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

জেহাদিদেরও প্রশিক্ষণ দিচ্ছে খৃস্টান জঙ্গিরা

সংবাদদাতা।। কেন্দ্র সরকার নাগাল্যাণ্ডের সন্ত্রাসবাদ থেকে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে নাগা উগ্রপন্থী দল এন এস সি এন (আই-এম)-এর শীর্ষ নেতৃদ্বয় আইজাক ও মুইভার সঙ্গে বৈঠক করছে। ঠিক তখনই ওই উগ্রপন্থী দলের নাগাল্যাণ্ড স্থিত হেডকোয়ার্টার ক্যাম্প হেব্রন-এ মুসলিম জিহাদী ও সন্ত্রাস-বাদীদের তিরিশ জনের এক দলকে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। বিশ্বস্ত সূত্রে এই খবর পাওয়া গেছে। তিরিশ জনের ওই মুসলিম যুবকদের নিম্ন-অসমের বরাক ভ্যালি অর্থাৎ কাছাড়, কারিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বেলালউদ্দিন নামের যুবক ওই দলটির নেতৃত্বে রয়েছে। উল্লেখ্য, বরাকভ্যালির জেলাগুলি মুসলিম অধ্যুষিত এবং ওই অঞ্চলে মুসলিম জিহাদীদের গতিবিধির খবর বেশ পুরনো। আবার কাছাড় ও করিমগঞ্জ জেলায় বিস্তীর্ণ খোলা সীমান্ত রয়েছে বাংলাদেশের সঙ্গে। সেজন্য অনুপ্রবেশ, অপহরণ, হিন্দু মেয়েদের ছলেবলে কৌশলে প্রেমের অভিনয় করে মুসলমান করার মতো ঘটনা নিয়মিত ঘটে চলেছে। এরপর তারা যদি এন এস সি এন (আই এম)-এর মতো শক্তিশালী জঙ্গি গোষ্ঠীর মদত পায় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। এছাড়া বরাক পর্বতের ওপারে উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলায় এন এস সি এন (আই-এম) জঙ্গিদের রমরমা দীর্ঘদিন যাবৎ বর্তমান, এন এস সি এন-জঙ্গিদের হাত ধরেই আবির্ভাব ঘটেছিল ডিমাসা জনগাতিদের উগ্রপন্থী সংগঠন ডি এইচ ডি অর্থাৎ ডিমা হালাম দাওগা-র। পরে ডি এইচ ডি দুটি গোষ্ঠীতে ধর্মমতের ভিত্তিতে বিভক্ত হয়। খৃস্টান জুয়েল গার্লোসা ডি এইচ ডি (গার্লোসা) গঠন করে। গত বছর গার্লোসা গোষ্ঠী আত্মসমর্পণ করে অস্ত্র-শস্ত্র জমা দেয়। ফলে এন এস সি এন (আই এম) তাদের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি, প্রশিক্ষণ এবং তোলা আদায় বাবদ যে নগদ অর্থ পাচ্ছিল তাতে ভাঁটা পড়ে। সেজন্যই এবার নাগা জঙ্গিরা মুসলিম জেহাদিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে বলে ওয়াকিবহাল মহলের অভিমত। প্রসঙ্গত, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদের নিয়ন্ত্রণ খৃস্টান বহুল হওয়াতে চার্চের জড়িত থাকা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মূল লক্ষ্য বিচ্ছন্নতাবাদের মাধ্যমে ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করা হলেও অস্ত্র দেখিয়ে, অপহরণ করে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করাটা অন্যতম লক্ষ্য।

Swastika
28 June - 2010, Rs. 4.00 only
RNI No.5257/57
Registration No. Kol. RMS / 048/2010 -2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O. / SSRM-Kol. RMS/ RNP-048/LPWP-028/2010 -12

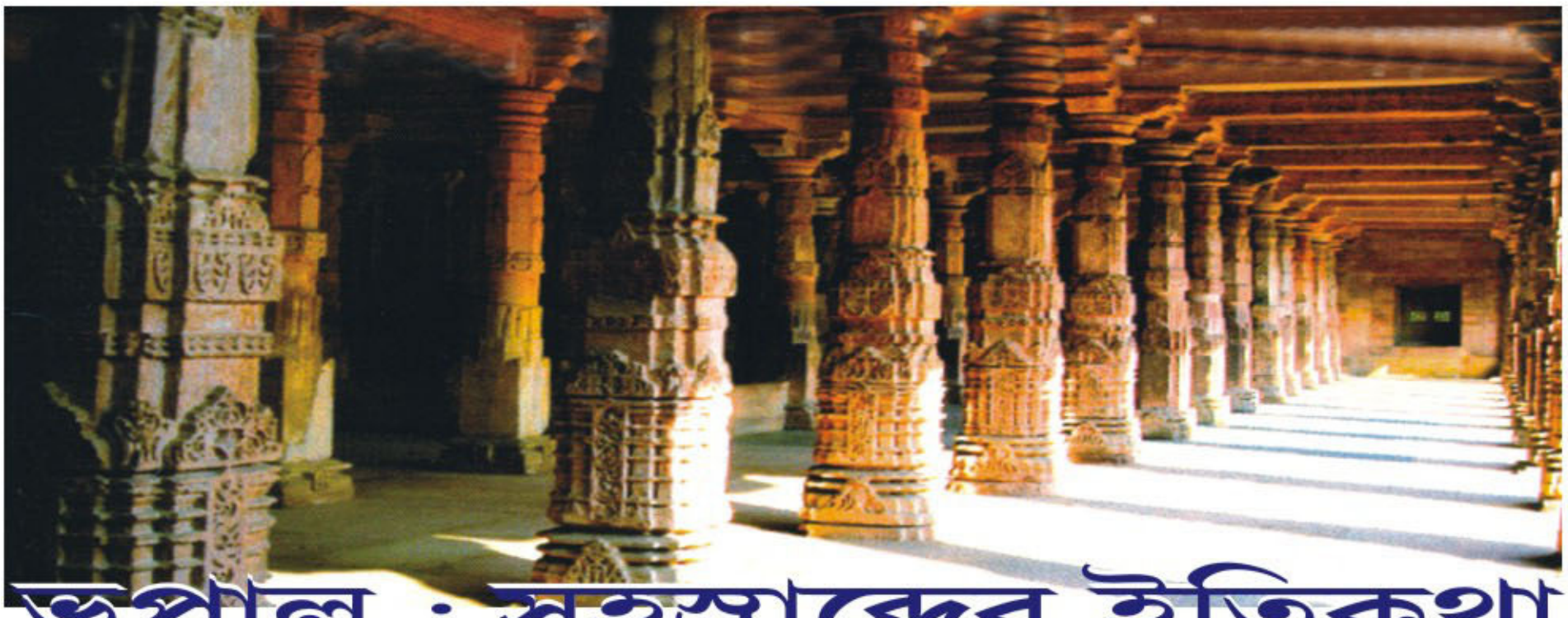

ভূপাল : সহস্রাব্দের ইতিকথা

নিজস্ব প্রতিনিধি।। মালওয়ার মহারাজা ভোজ। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে (১০১০-১০৫৩) অনেক অমর কীর্তির অধিকারী তিনি। সেই কীর্তির মহিমা সুদীর্ঘ সহস্রাব্দ পার করেও অম্লান। সিকি শতাব্দী পূর্বের কোনও রাসায়নিক দুর্ঘটনা সেই কীর্তিগাথাকে খানিক ব্যাহত করলেও তাকে একেবারে থমকে দিতে পারেনি। বরঞ্চ কোনও 'বনলতা সেনে'র খোঁজেই পূর্ণ উদ্যমে তা জীবনের সব স্পন্দনটুকু নিঙড়ে দিয়ে মহারাজা ভোজকে ইট-কাঠ-পাথরের পাঁজরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এই সন্ধানী জনপদের নাম ভূপাল। গ্যাস কাণ্ডের বিভীষিকায় যা আজ সংবাদপত্রের শিরোনামে। তবে একে কেবলমাত্র একটি আধুনিক শহর বলে ভাবলে মারাত্মক ভুল করবেন। এর পরতে পরতে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস। সেই ইতিহাস চর্চায় একটু মন দেওয়া যেতেই পারে।

শহর এবং দেশের স্থাপত্যশিল্পের বিষয়ে ভোজরাজ সম্যক অবহিত ছিলেন। যার প্রমাণ 'সমরাঙ্গানা সূত্রধর' নামক একটি বিশালাকায় গ্রন্থ। যে গ্রন্থে প্রায় ৮৩টি পর্ব রয়েছে যাতে লিপিবদ্ধ করা আছে অনিন্দ্যসুন্দর সব স্থাপত্য কর্মের নিদর্শন। ভারতবর্ষের ইতিহাস আর পরম্পরার সাথে নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সাযুজ্য বজায় রেখে ভোজ মহারাজের কীর্তি তিনটি বিত্ত-বিলাসিনী নগর স্থাপন করা। সেগুলি হলো,—মণ্ডপদুর্গ, ধারানগরী এবং হ্রদ বিশিষ্ট শহর ভোজপাল। এর মধ্যে ধারানগরী ছিল মহারাজা ভোজের রাজধানী। এই তিনটি নগরের অনবদ্য শিল্পকীর্তি আজও বিদ্যমান। এদের চিনতে পারছেন না? সেদিনের সেই মণ্ডপদুর্গ হলো আজকের মাণ্ডু, অন্যদিকে ধারানগরী হলো ধার এবং ভোজপাল বলাই বাহুল্য এখনকার ভূপাল।

তবে মহারাজা ভোজের জহুরীর চোখ ভূপাল নামক জহরটিকে চিনতে বিশেষ ভুল করেনি। বিশেষ করে এর ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর হ্রদ থাকার কারণে জীব-বৈচিত্র্যের বিপুল সমাহার মহারাজের দৃষ্টি এড়ায়নি। ভারতবর্ষের একদম মধ্যিখানে হওয়ার জন্য ব্যবসায়িক অবস্থানের অনুকূলতাও তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন ভূপালের মধ্যে। তাঁর এই ভাবনাকে আরও ইন্ধন যুগিয়েছিল ভূপালের অদূরেই অবস্থিত বৃহদ্ ভীমকুণ্ড।

ভূপালের উচ্চহ্রদ (আপার লেক)-কে ধরে এর আয়তন ৬৪৮ বর্গ কিলোমিটার। রাজা ভোজের পৌত্র উদয়াদিত্য পারমারের অন্যতমা পত্নী এ বিষয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমাদের দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, সভা মণ্ডল নামে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ১১৮৪ সনে। পরবর্তীকালে এটিই নাকি কুদাসিয়া বেগমের দ্বারা অপহৃত হয়ে জামা মসজিদে রূপান্তরিত হয় (তথ্যসূত্র ঃ ইম্পেরিয়াল গেজেটর অব্ ইন্ডিয়া ১৯০৮, ভলিউম ১২, পৃষ্ঠা ১৪৩)। কথিত আছে, সেই মন্দির চত্বর এতটাই সুবিশাল ছিল যে তার গর্ভগৃহে অন্তত পাঁচশ' পুরোহিত থাকতেন। প্রসঙ্গত, ভোজরাজ পারমার-এর রাজত্বের অবসান ঘটে ১৩২৭ সনে।

এর পরের ইতিহাসটা অতীব দুঃখের। ধার আর মাণ্ডুর মতো সমৃদ্ধ দু'টো নগরী দিল্লীর খিলজী রাজবংশের খপ্পরে গিয়ে পড়ল। এবং মোটামুটিভাবে যাবতীয় মন্দির, ভোজশালা এবং প্রাচীন জ্ঞান-কেন্দ্রগুলোর পরিণতি ধ্বংসস্তূপ হতে বিশেষ দেরি হয়নি। পঞ্চদশ শতাব্দী-তে, হোসেন শাহ্ সেই কিংবদন্তী ভীমকুণ্ডের পঞ্চত্বপ্রাপ্তিতে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, তার সবকিছুই করেছিলেন।

ধর ভোজশালার পাথরের ছাদ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এক নারী আসক্ত আফগান যার নাম দোস্ত মহম্মদ খান জনৈক পাঠানকে হত্যা করে এবং তার স্ত্রী-কে তুলে নিয়ে গিয়ে বিবাহ করে (এ বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা শাখরিয়ার খানের 'বেগমস অব্ ভূপাল' বইতে পাওয়া যাবে)।

এই মহম্মদ খানের কুকীর্তির (বিশেষত হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের) অনেক বর্ণনা ইতিহাসের পাতায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। রাজপুত যুবক-যুবতীদের রক্তে বনগঙ্গা নদীকে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। পরে বনগঙ্গার নাম দিয়েছিলেন হালালি। যার মানে হলো যে স্থানে কাফেররা আত্মবলিদান দিয়েছেন। এই মহম্মদই পার্শ্ববর্তী গিন্নাউগড় (মধ্য ভারতবর্ষের শাসক গণ্ডস নাওয়াল শাহ্-এর রাজধানী)-এ চক্রান্ত করে দুধে বিষ মেশায় ও পরে তা আক্রমণ করে বহু রমণীর সর্বনাশ করে।

১৭২৬ সালে দোস্ত মহম্মদ খানের মৃত্যুর পর স্বস্তির শ্বাস ফেলে ভূপালবাসী। ইতিপূর্বে আত্মহত্যা করেছিলেন রাণী কমলাপতি। তাঁর কন্যারাই আপাতত শাসন করতে থাকেন ভূপাল। এরপর আসে বৃটিশ শাসন। প্রজারা হিন্দু হলেও, রাজ্যশাসনে মুসলমান প্রভাবের একটু রেশ ছিলই। দেশ স্বাধীন হবার পর নবাব হামিদুল্লা খান পাকিস্তানে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে মহারাজ ভোজের রাজ্য। আশঙ্কা ছিল ভূপাল না পাকিস্তানে চলে যায়। কিন্তু সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সাহসিকতায় ১৯৪৯-এর ১ জুন স্বাধীনতা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় ভূপাল। যা আজকের মধ্যপ্রদেশের রাজধানী-রূপেই পরিচিত। সহস্র বর্ষ পার করেও, বহু ঝড়-ঝাপটা সোয়েও মহারাজ ভোজের স্মৃতি আজও সেখানে অম্লান।

প্রকাশিত হবে ৫ জুলাই '১০
স্বস্তিকা
প্রকাশিত হবে ৫ জুলাই '১০

তথ্যসমৃদ্ধ ও মননশীল বিভিন্ন রচনা নিয়ে এবারের
শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যা
হিন্দুত্বের প্রহরী

সুলতানী আমল থেকে ইংরেজ আমল অথবা স্বাধীন ভারতবর্ষ– হিন্দুর নির্যাতন বন্ধ হয়নি। নির্যাতিত আতঙ্কিত হিন্দুকে কালে কালে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছেন একেক জন মহান পুরুষ। প্রণবানন্দ, সাভারকর, শ্যামাপ্রসাদ, ডাক্তারজী, বিপিনচন্দ্র পাল– এরকম ব্যক্তিত্বরাই তো ছিলেন হিন্দুত্বের প্রহরী। এঁদের স্মৃতিতর্পণে সাজানো এবারের শ্যামাপ্রসাদ সংখ্যার অনবদ্য সম্ভার। সঙ্গে থাকছে তাঁর পূর্বপুরুষদের ও পৈত্রিক বাড়ি নিয়ে বহু অজানা তথ্য।

– লিখেছেন –
ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ, ডঃ নির্মলেন্দু বিকাশ রক্ষিত, স্বামী যুক্তানন্দ, ডাঃ গুরুপদ শাণ্ডিল্য, কালিদাস বসু, দেবব্রত চৌধুরী, শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ণব নাগ প্রমুখ।

।। রঙিন প্রচ্ছদ।। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হচ্ছে।। দাম ঃ ছয় টাকা।।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩ কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।
সম্পাদক ঃ বিজয় আঢ্য, সহ সম্পাদক ঃ বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য। দূরভাষ ঃ সম্পাদকীয় - ৯৮৭৪০৮০৩৪৩, অফিস - ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১, বিজ্ঞাপন - ৯৮৭৪০৮০৩৪২, ২২৪১-০৬০৩, টেলিফ্যাক্স ঃ ২২৪১-৫৯১৫,
e-mail : swastika5915@bsnl.in / vijoy.adya@gmail.com, website : www.eswastika.com